যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১০ এপ্রিল ২০১৭

কলকাতা

৮ পাতার এই ক্রোড়পত্রটি যুগশঙ্খ-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

থার্ডআই ক্লিক: অফবিট কলকাতা

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে হাঁসফাঁস করছে শহর কলকাতা। কংক্রিটের জঙ্গলে যখন হারিয়ে যাচ্ছে ফুসফুস ভরে শ্বাস নেওয়ার মতো মুক্ত বাতাস, গাছেদের শীতল ছায়া, তখন অস্থির অবস্থা কাটাতে ময়দানে গাছের নীচে ঢাউস আকৃতির ভুঁড়ি বের করে শুয়ে পড়া অথবা হাওয়া খেতে খেতে জমিয়ে আড্ডা প্রাণশক্তির খোরাক বৈকি। মানুষ তো দু'দণ্ড বিশ্রাম নিচ্ছে আয়েশ করে। তবে এই ময়দানে ঘুরে বেড়ানো নজরদারদের চলমান সজীব-চেয়ার, ঘোড়াগুলোর কি বিশ্রাম নিতে নেই?

ফোটো: **সুজিত জানা** | লেখা: **তন্ময় মণ্ডল**

আমার চোখে কলকাতা

যশোধরা রায়চৌধুরী (কবি)

এই শহর জানে আমার প্রথম সবকিছু। সুমনের গানের এই লাইন যেমন সত্যি, তেমনি এটাও তো সত্যি যে প্রথম জাগরণে এই শহরকে যে পেয়েছি, তার জন্য আমি নই, আমার পরিবারের ইতিহাস দায়ী। শহুরে, আপাদমস্তক বাঙালি ভদ্দর-লোকের দেখা শহর কলকাতার দক্ষিণ কলকাতা থেকে উত্তরে রাজাবাজার, এপাশে রবীন্দ্রসদন-আকাদেমি চত্বর, উল্টোদিকের ময়দানে বইমেলা এক্সপো-লেক্সপোর অন্ধিসন্ধি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের, 'আমার শহর নয়কো তেমন বুড়ো/ অতীতকালের অস্থিমুদ্রা চৈত্য বিহার কিছু/পাবে না তার কোথাও মাটি খুঁড়ে' আবৃত্তি করা ইশকুলবেলা পেরিয়ে, জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পড়তে পড়তে বড় হয়ে গেলাম, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর অমলকান্তি রোদ্দুর হতে চেয়েছিল— দেখা চোখ নিয়ে ফিরে এলাম এই শহরের মধ্যখানেই, কলেজে।

প্রেসিডেন্সিতে পুনরায় জাগরণ। এবার চিনলাম কলেজ স্ট্রিট, সূর্য সেন স্ট্রিট থেকে শুরু করে যাবতীয় মধ্য কলকাতার আশ্চর্যকে। ভালোবাসলাম, রোমাঞ্চিত হলাম এই শহরের প্রেমে। ফুচকাখোর, বুড়োদার চায়ের দোকানের বিটনুন দিয়ে লেবু-চা-খোর বাঙালির ব্যক্তিত্ব নিয়ে ঘুরে বেড়ালাম বাঁদিকে সামান্য হেলে, বইয়ের ভারী ঝোলাব্যাগ নিয়ে, সেই কোন আশির দশকে।

তারপর চাকরিসূত্রে দূরে গেলাম এই শহরের ওপরেই অভিমান করে খানিক। তখন জেনে গেছি, এ কলকাতার মধ্যে আছে আরেকটা কলকাতা। শঙ্খবাবুকে এখনও প্রবাদোপম লিখতে দেখার সৌভাগ্যের সঙ্গে মিশে গেছে সেই জ্ঞানটুকু।

আবার, আবার ফিরে এসেছি, পরের পর অভিজ্ঞতায় পেয়েছি নতুন সব শহরাঞ্চলের মাপ মতো কাটাকুটি রাস্তা আর পার্ককে... কিন্তু হারায়নি দক্ষিণ কলকাতার বাজারহাট। পরিবর্তন ঘটেছে অনেক, বড় বড় সব শপিং মল, সুপারমার্কেট এসেছে, কিন্তু এখনও সরিয়ে দিতে পারেনি শহরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সব দোকানকে... পাড়ার মোড়ের চপ বা মোগলাই পরোটাকে।

এই সবটা, সমস্তটা নিয়েই আমার নিজস্ব কলকাতা। শুধু খুঁজে পাইনি আর সেই এ মুখার্জির সরুমতো বইটাকে... কবিতার কলকাতা। কী অসম্ভব সব কলকাতাবিষয়ক কবিতা ছিল তাতে।

চলতে চলতে কলকাতা দেখা: এসপ্ল্যানেড টু গালিফ স্ট্রিট

রসেবশে রয়াল ১১২-তে

পান্থজন

গত সপ্তাহেই বলেছিলাম নাকে আসছে সুঘ্রাণ, আর নাকে খাবারের গন্ধ মানেই জিভে জল। দু'পা এগোতেই দেখলাম, এক মাঝবয়সি লোক মনোযোগ সহকারে খুন্তি দিয়ে খাবার তুলছেন। চিকেন চাপ। আহা কী ভালো কী ভালো! একভাবে অনেকদিন ধরে পথে পথে ঘুরলে ক্ষুধা-তৃষ্ণা পাওয়া তো স্বাভাবিক, কিন্তু এই মুহূর্তে চিৎপুর রোডের যে-রেস্তোরাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আমার এই ক্ষুধা, সেটা চোখের খিদে না মনের খিদে, ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। রয়াল ইন্ডিয়ান হোটেল, ছোট থেকে নাম শুনে এসেছি। শহরের বিখ্যাত হোটেলগুলির মধ্যে এটা যে অন্যতম তাও জানতাম। এও শুনেছি যে মহানায়ক উত্তমকুমার নাকি এখানকার বিশেষ কয়েকটি পদ খেতে ভালোবাসতেন। রাত-বিরেতে এখানে লোক পাঠাতেন বাড়িতে খাবার নিয়ে যাওয়ার জন্য।

প্রাচীন এই জনপদের পুরনো এই রেস্তোরাঁর ইতিহাস শোনার জন্য যখন প্রস্তুত হচ্ছি, এমন সময় ভাবলাম আমার জিজ্ঞাসু মনকে শান্তি দিতে আগে ডান হাতের কাজটা সেরে নিই। খেতে খেতে খোঁজ করি হোটেল মালিকের। বেয়ারার মাধ্যমে জানতে চেষ্টা করি তাঁর নাম-ধাম, নাড়ি-নক্ষত্র। সুস্বাদু খাবারের ঘ্রাণে মন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেও মাঝে মধ্যে সংবিৎ ফেরে। ভোজনের পালা সাঙ্গ করে আমার কৌতূহল নিবৃত্তির দিকে মন দিই। অনেক চেষ্টাচরিত্র করেও সেদিন কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির আর দেখা হয়ে ওঠে না। দূরভাষে কথা বলে আরেকদিন গিয়ে হাজির হই কলকাতার এই বিখ্যাত হোটেলে। উষ্ণ আতিথেয়তার পরে প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হলে জানতে পারলাম অতীতে শহরের ইডেন উদ্যানে টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে আসা পাকিস্তান দলের সদস্যরাও বেশ কয়েকবার এই রেস্তোরাঁয় এসেছেন। কলকাতার রসগোল্লা, দই, কলকাতার রোল, চানাচুরের মতোই প্রসিদ্ধ চিৎপুর রোডের রয়ালের চাপ। চাপ বস্তুটি মূলত দু'রকমের হয়। একটি চিকেনের, অন্যটি মটনের। এবারে এখানকার চাপ সহ অন্যান্য সুখাদ্যের এবং

বিচিত্র সব পদ আর রেস্তোরাঁর গোড়াপত্তনের কথা শোনা যাক।

রয়ালের পথ চলা শুরু হয়েছিল ১৯০৫ সালে। লক্ষ্ণৌ থেকে আসা আহমেদ হুসেন খুব ছোট করেই ব্যবসা শুরু করেন কলকাতায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেদিনের ছোট্ট রেস্তোরাঁটি আজ বড় আকার ধারণ করেছে। বর্তমান মালিক ইরফান জানালেন, তাঁদের বিশেষ পদগুলির মধ্যে রয়েছে চিকেন ও মটন চাপ, বিরিয়ানি, পাসিন্দা কাবাব, চিকেন লিভার, নার্গিস কোপ্তা। কিছু খাবারে অবশ্য পরিবর্তন হয়েছে। ১৯০৫ সালে বিরিয়ানি খাওয়ার চল ছিল না। তখন ছিল খুসকা, সেটাই সময়ের সঙ্গে চেহারা এবং নামে হয়েছে বিরিয়ানি যা শহরবাসীর কাছে আজ একটি জনপ্রিয় খাদ্যবস্তু। লক্ষ্ণৌ স্টাইলের বিরিয়ানি এখানে শুরু

এরপর দুইয়ের পাতায়

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১০ এপ্রিল ২০১৭

চৈত্র সেলের প্রেম বনাম প্রেমের চৈত্র সেল

অঙ্কন চট্টোপাধ্যায়

বলা হয়, চৈত্রমাস প্রেমের মাস। এইসময় নাকি আকাশে-বাতাসে প্রেমের জীবাণু ঘুরে বেড়ায়। চৈত্রমাসের ফুলে-পাতায়, রাস্তায়-ঘাটে, এমনকী পাশের বাড়ি থেকে ভেসে আসা রবিবারের স্পেশাল মাংসের গন্ধেও প্রেম হতে পারে। আবার ধরুন, এইসময় স্বয়ং প্রকৃতিদেবীও ক্ষুদ্র মানব-সন্তানের প্রতি সহায় হন। তিনি প্রেমের চিরায়ত হেল্পার হিসাবে গাছের ডালে ডালে ফুটিয়ে দেন কৃষ্ণচূড়া ফুল, পাতায় রং করে দেন সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল। আর সেই কৃষ্ণচূড়ার উপর দিয়ে বয়ে চলা ঝিরিঝিরি হাওয়ার মাঝে দাঁড়িয়ে কারও হৃদয়ের একূল-ওকূল দু-কূল ভেসে যায়। যদি কদাপি চোখের সামনে এহেন সরষেফুল দেখেন আপনাকে ধরে নিতে হবে আপনি প্রেমে পড়েছেন। এবং তার ফলস্বরূপ আপনাকে করতে হবে প্রেমনিবেদন, সঙ্গে দিতে হবে কিছু উপহার আর চাট্টি গোলাপ। এবার কথা হল, যেহেতু গোলাপ ফুল তুলতে গিয়ে হাতে এখন আর কাঁটা লাগে না, পাড়ার মোড়ে মোড়ে গোলাপ ফুলের দোকান, তাই শুধু গোলাপ দিয়েও চিঁড়ে খুব একটা ভেজে না। তাহলে বুঝতেই পারছেন, এখন গোলাপ হয়েছে সেকেন্ডারি, প্রাইমারি আইটেম হল উপহার (অনেকেই আমার এই বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন, তারা আপাতত নিজেদের গর্ব করে ব্যতিক্রমী ভাবতে পারেন)। তা এই উপহার পাবেন কোথায়?... খুব সহজ। চৈত্র সেলে। চৈত্রমাসের প্রেমে চৈত্র সেল তো উপরি পাওনা। সস্তায় পুষ্টিকর আবার বেশ টেঁকসই (এটা প্রেমের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য)। হ্যাঁ, মানলাম, না হয় অনলাইন শপিং জিনিসটা ইদানীং ভালো বাজার করেছে, কিন্তু সেখানে তো আর চৈত্র সেলের 'বাম্পার অফার' বা 'বসন্ত মহাধামাকা অফার' নেই, আর সেখানে এমন ঘুরে ঘুরে এটু বিবেকানন্দ মোড়ের ফুচকা, এটু অনাদির মোগলাই পরোটা, এটু প্যারামাউন্টের ঠান্ডা শরবত খেয়ে ফের দোকানে গিয়ে দরকষাকষি করে ভালো জিনিসটি কেনাও নেই, তাই চৈত্রমাসের প্রেমাস্পদের কাছে এবং অবশ্যই বাঙালির কাছে চৈত্র সেল একমেবাদ্বিতীয়ম।

এবার ধরুন কোন কোন জায়গাগুলো চৈত্র সেলের হটস্পট? কোথায় গেলে পাবেন আদর্শ সেল? এত অতি সহজ, বলে দিতে লাগে না, তবুও না বললে ঈষৎ ছন্দপতন হয় তাই বলছি, গড়িয়াহাট, হাতিবাগান, ধর্মতলা এসব হল ভৌগোলিক অঞ্চল অনুযায়ী চৈত্র সেলের উষ্ণতম জায়গা। এই জায়গাগুলোয় আপনি সবই পাবেন। অথচ দাম বেশ কমই। শোনা যায়, বনশালির পারো নাকি কোনও এক চৈত্রে হন্যে হয়ে সারা হাতিবাগান ঘুরে কেনাকাটি

করে তবে পুরোপুরি পারো হতে পেরেছিলেন। আর এখানকার নায়িকারাও নাকি সবই হাতিবাগান-গড়িয়াহাট ঘুরেই সারা বছরের 'এক্সক্লুসিভ কালেকশন' জমিয়ে রাখেন। (এও আমার শোনা কথা)। আমার আরও এক শোনা কথা আছে। এক বিখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীর সাক্ষাৎকারে বলতে শুনেছিলাম, তাঁর শাড়ির প্রতি এমনতরো ফ্যাসিনেশন যে বাড়িতে অতিরিক্ত শাড়ি কেনার চোটে তাঁকে বকুনি পর্যন্ত খেতে হয়েছে। তবুও তাঁর এমন ধনুকভাঙা পণ যে তিনি আবারও শাড়ি কেনেন এবং পরিপাটি করে তাঁর বিছানার তোষকের নিচে ভাঁজ করে লুকিয়ে রাখেন। তার এরকম লুকিয়ে রাখা শাড়ির সংখ্যাই নাকি অনেক।

তবে? আপনার স্ত্রী-ই-বা কম যায় কিসে? তাদের তো দুর্গাপুজো থেকে ঘেটোষষ্ঠীর ব্রত অবধি ওই কটা শাড়ি লাগবেই। আবার ধরুন, শুধু শাড়িই তো নয়, জামা, ধুতি, লুঙ্গি, ফ্রক, এসবও সঞ্চয়ের মাধ্যম হল চৈত্র সেল। আর এখন তো টেডি বিয়ারের ওপরেও সেল চলছে। ধরুন একটা মনুষ্য-সমান টেডির দাম ধরা হল এক সহস্রমুদ্রা, এরপরে তার পেটের চেন খুলে ভেতর থেকে খানিক তুলো কমিয়ে, খানিক হাওয়া বাড়িয়ে সেটা সাতশত পঞ্চাশে দাঁড় করানো হল। চোখের পাতা ফেলবেন না তার আগেই দেখবেন কোনও এক সুইটি তার সুইটির জন্যে কিনে নিয়ে চলে গেছে। তাছাড়া সানগ্লাস, টুপি, একটা কিনলে আরেকটা ফ্রি-বডি-স্প্রে, কোমরের ইলাস্টিকে বিদেশি কোম্পানির লেবেল সাঁটা অন্তর্বাস, হুঁকোর মশলা সবই তো চৈত্র সেলের অঙ্গ। আর এসব দিনকে দিন বাড়ছেই। বাড়ছে কখনও পুজোর বাজারের বিকল্প হিসাবে, কখনও বিয়েবাড়ির প্রণামীর বান্ডিল বান্ডিল সংগ্রহ হিসাবে, কখনও সংসারের বাৎসরিক রসদ হিসাবে আবার কখনও সংসারের অস্বচ্ছলতার আক্র হিসাবে।

...অনেকটা বললাম আপনাকে, আপনাদের নিয়ে। এবার একটু আমাদের কথায় আসি। আমরা, মানে আমরা ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে গোটা বাঙালি জাতিটা, যাদের মাস পড়লে পেট চালাতে কোনও অসুবিধে হয় না বটে, কিন্তু মানিব্যাগটা একবার হাতড়ে দেখতে হয়; যাদের এই চৈত্র সেলের কেনাকাটির আগে পরনের জামাটা ছিঁড়ে বেখাপ্পা হয়ে ঝোলে না, কিন্তু সেলাইটা প্রায় খুলে আসে, যাঁরা এখনও ট্রামে বসে বসে ফিরতি পথে ভাবেন যে, ঘরে ছেলের দুধের কৌটোর অবশিষ্ট দুধটা পরের মাসে মাইনে হওয়া অবধি চলবে কিনা, একটু তাঁদের জন্যে বলি... হোক না পাতলা, যাক না দু'বার ধোয়ার পর রং উঠে, বছর ঘুরতেই যাক না ছিঁড়ে-ফেটে তবুও, পয়লা বৈশাখের দিন সক্কাল-সক্কাল স্নান করে, ঘাড়ে-গলায় বেশ করে সুগন্ধি ট্যালকম পাউডার দিয়ে যখন চৈত্র সেলে রোজ পরার জন্যে কেনা নিতান্তই ছাপোষা সস্তার চকরাবকরা পাঞ্জাবিটা বা শাড়িটা গায়ে দিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ানো হয়, সত্যি করে বলুন তো মনে হয় না বয়েস দশ বছর কমে গেছে? মনে হয় না এইতো বিয়েবাড়ির সাজ? নিজের উপর আরও একটু প্রেম জাগে না? মনে হয় না আরও বেশ কয়েক বছর বাঁচব?... কি? মনে হয় তো?

TEAM কলকাতা

শর্মিলা চন্দ্র
(কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর)
তন্ময় মণ্ডল (সাব-এডিটর)
সুদীপ্ত বিশ্বাস
অতনু পাল (ফোটোগ্রাফার)

চলতে চলতে কলকাতা দেখা: প্রথম পাতার পর

করা হয় ১৯৩৫ সাল নাগাদ। আগে শহরের অনেক সেলিব্রিটি এখানে আসতেন। এখন তাঁদের বাড়িতে বা বাইরে থেকে আসা অতিথিদের হোটেলে খাবার পাঠিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে পার্ক সার্কাস অঞ্চলেও রয়ালের একটি শাখাকেন্দ্র খোলা হয়েছে।

ইরফান আরও জানালেন যে কলকাতায় খেলা হলেই ওয়াসিম আক্রম, জাভেদ মিয়াঁদাদ নিয়মিত আসতেন। তাঁরা এখানকার খাবার বিশেষভাবে পছন্দ করতেন। ইন্ডিয়ান রয়াল হোটেলের একতলা ও দোতলা মিলিয়ে রয়েছে তিনটি বিভাগ। একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, অন্য দুটি সাধারণ। পদগুলি দেখে মনে হয় আওধের সবরকম মোগলাই খাবারকেই তাঁরা উঠিয়ে নিয়ে এসেছেন কলকাতায়। লক্ষ্ণৌ ঘরানার পদ তৈরি করতে এখানকার শেফেরাও এসেছেন ওই শহর থেকেই। অতীতের কারিগরদের ছেলে বা নাতিরা এখন হোটেলের সঙ্গে যুক্ত। ইরফান সাহেবের প্রপিতামহ আহমেদ খান লক্ষ্ণৌর খুব জনপ্রিয় শেফ ছিলেন। ওখানকার বড় বড় নবাবদের খানা এবং দাওয়াত তৈরিতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। নাখোদার আধ্যাত্মিক পরিবেশ ছেড়ে এসে রয়ালের অন্দরমহলে প্রবেশ করে নিজের রসনাকে তৃপ্ত করে এক অন্য ইতিহাস শুনলাম।

হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে ভাবছিলাম কী বিচিত্র এই শহর। একদিকে যেমন আছে ঔপনিবেশিকতার ছাপ, অন্যদিকে রয়েছে বাংলার বাইরে থেকে আসা বিভিন্ন জাতি এবং ভাষাভাষীর সংস্কৃতি, রীতি-নীতি এবং নানান খাদ্যের সম্ভার। এক রাস্তা, অনেক গল্প, অনেক ইতিহাস। সামনের দিন আরও কিছুটা এগোবো, আবার অন্য কোনও একটি ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখব চিৎপুরের পথকে কেন্দ্র করে।

ফোটো: লেখক

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১০ এপ্রিল ২০১৭

রহিম চাচার ডেরা

বীথি চট্টোপাধ্যায় (লেখিকা)

কলেজে পড়বার সময় থেকেই শুনেছি যে কলকাতার অনেক জায়গায় নাকি ভূত আছে। রাইটার্স বিল্ডিং তো একসময় নাকি ভূতেদের একচ্ছত্র আস্তানা ছিল। আমি যখন কম বয়সে পায়ে হেঁটে কলকাতাকে দেখেছি অথবা এখন যখন গাড়ি থেকে কলকাতাকে দেখি, তখন এই ভূতের বিষয়টি প্রায়ই মনে আসে। একদিন বিকেলে পুরনো নিউ মার্কেটের ভিতর ঘুরছিলাম। বেশ কয়েক বছর পর নিউ মার্কেটে গিয়েছিলাম সেবার। কলকাতায় ইতিমধ্যে বহু শপিংমল তৈরি হয়েছে। সাউথ সিটি মল, কোয়েস্ট মল, অ্যাক্রোপলিস মল, আর-ও কত কী। এইসব মলে যা যা পাওয়া যায় নিউ মার্কেটে সেই সবই পাওয়া যায়, আবার নতুন নতুন মলে যা কিছু পাওয়া যায় না তাও পাওয়া যায় নিউ মার্কেটে। দশ টাকার জিনিস পাওয়া যায়, দশ লক্ষ টাকার জিনিস পাওয়া যায়। এইসব ভাবতে ভাবতে নিউ মার্কেটে ঘুরছিলাম। সস্তায় শ্বেত পাথরের টেবিল, শোপিস পাওয়া যেত এখানকার একটা দোকানে। সেই দোকানটা খুঁজছিলাম। মনে মনে ভাবছিলাম দোকানটা গেল কোথায়? আমি তো দোকানটা স্পষ্ট চিনি। নাহুমস বলে এখানে যে-বিখ্যাত কেকের দোকান, তার বিপরীতেই তো ছিল সেই দোকান। বছরখানেক হবে এদিকে আসা হয়নি, তার মধ্যে দোকানটা উঠে গেল নাকি? নাহুমসের সামনে দাঁড়িয়ে এধার-ওধার দেখছি। পা-দু'খানি ভারী ভারী লাগছে, ক্লান্ত লাগছে। এমন সময় আমার পিছন থেকে বেরিয়ে এলেন রহিম চাচা। সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা, মাথায় টুপি, ছোটখাটো চেহারা। বেশ অবাক হলাম। প্রায় কুড়ি বছর রহিম চাচাকে দেখিনি। আমি ভেবেছিলাম তিনি বুঝি আর নেই। তিনি নিউ মার্কেটে কুলি ছিলেন প্রথমে, তারপর ধীরে ধীরে নিউ মার্কেটের অনেক কিছু তিনি শাসন করতে শুরু করেন। হকারের থেকে কমিশন, জিনিসের বিক্রি থেকে বখরা, কোন ভিখিরি কোথায় বসবেন এসব বিষয়ে ওঁর অধিকার জন্মায়। মার্কেটে অনেকগুলি দোকানের মালিক হয়ে যান রহিম মিঁয়া। বহুযুগ আগে তখন আমি কলেজে পড়ি; নিউ মার্কেটের আনাচে-কানাচে রহিম মিঁয়ার দাপট দেখেছি। তবে সাধারণ খদ্দেরদের সবসময় সাহায্য করতেন রহিম মিঁয়া আর তাঁর লোকজন। আমি যখন কলেজের গণ্ডি পেরোইনি তখন থেকে রহিম মিঁয়াকে চিনি, তিনিও আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করতেন যেন আমি ওর খুব কোনও আপনজন। কলেজের ছাত্রদের হাতে তখন পয়সা থাকত না একেবারে। পুজোর বাজার করতে বা বড়দিনে নিউ মার্কেটে বেড়াতে এলে প্রায়ই রহিম মিঁয়া বলে দিতেন কোথায় পাবো শাড়ির পাড়, জামায় বসানোর লেস। নিজের লোক দিয়ে দোকান চিনিয়ে দিয়ে আসতেন। তখন তো তাঁর লোকজনের হাতে সেভাবে বকশিস দিতে পারতাম না, কিন্তু রহিম চাচা প্রতিবারই সাহায্য করতেন। বিশাল আকারের চারটি কুকুর ছিল তাঁর। তারা রহিম চাচার দুপাশে সার বেঁধে শুয়ে থাকত। একটা বেড়াল থাকত রহিম চাচার কোলে। তার নাম নূরী। যখন রহিম চাচার সঙ্গে আমার একটা পাকাপাকি স্নেহ-ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল তখন নূরীকে কত কোলে নিয়েছি। নূরী ছিল যেন ঠিক রহিম চাচার মেয়ে, তার মানে সে আমার বোন হতো সম্পর্কে। তবে নূরী বোধহয় আগন্তুকদের এত আদিখ্যেতা পছন্দ করত না। কোলে নিলে ঝটপট করে নেমে যেত, ঢুকে যেত টেবিলের তলায়। কিছু কিছু ব্যক্তিগত কথা হতো রহিম চাচার সঙ্গে। বছরের পর বছর ধরে বলা টুকরো টুকরো কথা সে-সব। জেনেছিলাম ছেচল্লিশের দাঙ্গায় রহিম চাচার পুরো পরিবারটি ধ্বংস হয়। রহিম চাচার বয়েস তখন আট বছর। আল্লাহর মর্জিতে তিনি বেঁচে যান। মসজিদের সামনে বসে ভিক্ষে করতেন ছোটবেলায়। তারপর কুলি, তারপর রীতিমতো মস্তান হয়ে ওঠেন। তাঁর নামে নাকি মানুষ খুনের মামলাও হয়েছিল। প্রমাণ করা যায়নি। রহিম চাচা মাথা নেড়ে নেড়ে এসব বলতেন। নিউ মার্কেটে আমার তেষ্টা পেলে, দোকানে দোকানে ঘুরে পা ব্যথা করলে রহিম চাচার দোকানে বসে বিশ্রাম নিতাম। তারপর একদিন দেখলাম রহিম চাচার কোল শূন্য। সেখানে নূরী নেই। নূরী না ফেরবার দেশে চলে গেছে। শূন্য কোলে রহিম চাচাকে কী উদাস দেখাচ্ছিল। নূরী যেভাবে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল সেভাবে আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে গেল রহিম চাচার দোকানের বুড়ো কর্মচারী, সময়ের নিয়মে উবে গেল ওঁর কুকুর। চারপাশের কত দোকান বদলে গেল। হয়তো ছিল কাপড়ের দোকান হয়ে গেল বাসনের। রহিম চাচার বয়েস বেড়ে চলল। নতুন মস্তান উঠে এল মহল্লায়। রহিম চাচা পুরোদস্তর দোকানদার হয়ে গেলেন। আমিও বাউন্ডুলে ছাত্র থেকে হলাম হিসাবি নাগরিক। কিন্তু আমাদের পুরনো সম্পর্ক বজায় ছিল। এরপর একদিন নিউ মার্কেটে গিয়ে আর রহিম চাচাকে দেখলাম না। তাঁর কাপড়ের দোকানে তাঁর চেয়ারটি দেখলাম শূন্য। তারপর একদিন দেখলাম তাঁর কাপড়ের দোকানে অন্য এক মারোয়াড়ি ভদ্রলোক। তিনি খুব ভক্তিভরে মা লক্ষ্মী আর গণেশের ছবিতে মালা পরাচ্ছেন। বছর দুই পরে সেই মারোয়াড়ি ভদ্রলোকটিকেও আর দেখা গেল না। ওই কাপড়ের দোকানে গড়ে উঠল একটি ছোট বিউটি পার্লার। এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মহিলাকে সেখানে বসে থাকতে দেখলাম একবার। ক্রমে কেটে গিয়েছে প্রায় কুড়ি বছর। আমার নিজের নিউ মার্কেট যাওয়া এখন প্রায় হয়েই ওঠে না। হঠাৎ কিছুদিন আগে আমার বাড়ির একটা খুব পুরনো শ্বেত পাথরের টেবিল ভেঙে গেল। ওই রকম আর একটা টেবিল কোথাও পাই না। আবার অনেকদিন পরে গেলাম নিউ মার্কেটে। কিন্তু শ্বেত পাথরের জিনিস বিক্রি হতো যে দোকানে সেটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। হাঁপিয়ে উঠছিলাম। সেই সময় আকস্মিক সামনে এসে পড়ল রহিম চাচা! এতদিন পরে! চেহারা তো বিশেষ কিছুই বদলায়নি! আমাকে বললেন, 'আর আসেন না তো এদিকে? আমাদের ভুলে গিয়েছেন?' আমি কিছুটা বিহ্বল হয়ে বললাম এদিকে আসা হয় না এখন খুব একটা, কিন্তু আপনাদের কি ভুলতে পারি রহিম চাচা? আমি তো আপনাকে খুঁজেছিলাম। আপনি কোথায় ছিলেন এতদিন।' রহিম চাচা হাসলেন 'রিস্তেদারের কাছে।' বলে আমাকে হাত নেড়ে ডেকে নিজে হাঁটতে শুরু করলেন। এই ভঙ্গি আমি খুব চিনি। রহিম চাচা এবার আমাকে দোকানটা চিনিয়ে দেবেন। আমি হাঁটলাম ওঁর পেছন পেছন। নিউ মার্কেটের পিছনে একটা দোকান দেখিয়ে দিলেন আঙুল তুলে। সেটা শ্বেত পাথরের আসবাবের দোকান। এই দোকানটা আমি চিনতাম না। যে-দোকানটা চিনতাম তার মানে সেটা আর নেই। দোকানে ঢুকবার আগে রহিম চাচাকে বললাম, আসুন আপনিও। তিনি বললেন, আপনি যান, কিনুন জিনিস। আমি এখানেই আছি। এখানেই থাকব। পছন্দ মতো টেবিল কেনা হল। দোকান থেকে ওরা টেবিল বাড়িতে দিয়ে যাবে টেম্পো করে সেই ব্যবস্থা করলাম। দোকান থেকে বেরিয়ে রহিম চাচাকে খুঁজছি। ওঁর কাছে বিদায় নেব বলে, কথা বলব বলে। কিন্তু কোথায় গেলেন রহিম চাচা? আমাকে যে বললেন এখানেই আছি, এখানেই থাকব। এতদিন পরে তিনি কোথা থেকে এলেন? কুড়ি বছর পার হয়ে যাবার কোনও ছাপ নেই কেন ওঁর চেহারায়? আমার বয়েস বেড়েছে কিন্তু রহিম চাচার বয়েস বাড়েনি কেন? আমি যে শ্বেত পাথরের টেবিল খুঁজছি তা উনি জানলেন কীভাবে? অদ্ভুত! আমি দোকানটা চিনতাম বলে আশেপাশে কাউকে তো জিজ্ঞাসাও করিনি কিছু। রহিম চাচা বুঝি এখন না বলা কথা বুঝতে পারেন?

পুরনো নিউ মার্কেটের ওপর অন্ধকার নেমে আসছে। জায়গাটা ফাঁকা। চারপাশের পুরাতন শেওলা ধরা দেওয়ালগুলো গম্ভীর। ফিরব বলে পা বাড়ালাম। কোনও পুরনো দেওয়ালের পাশে হয়তো রহিম চাচা দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

(চলবে)

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ১০ এপ্রিল ২০১৭

হায় রে বাঙালি! কীভাবে তুমি নিজের সম্পদ হাতছাড়া করছ...

জয় চক্রবর্তী

শতবছর আগে প্রায় কেউই গাড়ি চালাতেন না। চর্চা ছিল না ফোন কলেরও। বৈদ্যুতিক বাতি সীমাবদ্ধ ছিল হাতেগোনা জায়গায়। রেকর্ডেড সংগীত, মুভি দেখা, বিমানে চড়া, রেডিও শোনা, টিভি দেখা, কম্পিউটার ব্যবহার করা, ই-মেইল করা কিংবা স্মার্টফোন ব্যবহার করা– এগুলোর কথা কে-ই বা ভেবেছিল? এক্স-রে, বডি স্ক্যানার, ডিএনএ টেস্ট, অঙ্গ সংস্থাপন, অ্যান্টিবায়োটিক কি ছিল তখন? কত মানুষ তখন অকালে মারা যেত।

সেই সময় থেকে বর্তমানে সবকিছুরই পরিবর্তন ঘটেছে। বস্ত্র দিয়ে শিল্প বিপ্লবের শুরু। মানবজাতি ধীরে ধীরে নিত্যনতুন উদ্ভাবন আর তার সেবা গ্রহণে অভ্যস্ত হল। ইন্ডাস্ট্রির তালিকায় যুক্ত হল আনকোরা সব নাম– বিদ্যুৎ, অটোমোবাইল, অ্যারোস্পেস, এভিয়েশন, তেল-গ্যাস, টেলিযোগাযোগ, ওষুধ ও বায়োটেকনোলজি, কম্পিউটার, তথ্যপ্রযুক্তি, মিডিয়া এন্টারটেইনমেন্ট আরও কত কী! অন্যদিকে ঘোড়ার গাড়ির ওয়াগন, অযান্ত্রিক সমুদ্রযান, বাষ্পীয় ইঞ্জিন, মোমবাতি-ম্যাচ, কুপি-হারিকেন ম্যানুফ্যাকচারাররা নিজের ইন্ডাস্ট্রির ধীর মৃত্যুটা চেয়ে চেয়ে দেখলেন। এভাবেই আধুনিকতার সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে পরিবর্তন ঘটল রাজ্য তথা দেশের অন্যতম বৃহত্তর বাজার বড়বাজারেরও। একদিকে যেমন ব্যবসার পণ্যের পরিবর্তন এল, সাথে সাথেই ব্যবসার চরিত্র, ব্যবসায়ীদের ধরন সবকিছুতেই পর্যায় ক্রমে বদল এল।

ইতিহাসের পাতা বলে ইংরেজ শাসনকালের বহু আগেই এখানে বস্ত্র ব্যবসা শুরু হয়। সুতানুটি হাট নামের তৎকালীন সেই বাণিজ্য কেন্দ্রে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে ব্যবসা করে ব্যবসায়ীরা ব্যাপকভাবে লাভবান হয়েছিলেন। তার ফলে সেই বাজারের পসার ক্রমশ বাড়তে থাকে। তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার সব প্রান্ত থেকে মানুষ এই বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতা হিসাবে আসতে শুরু করেন। ১৮ শতকে এই বাজারের পরিধি ছিল ৫০০ একরের বেশি। শুধু ক্রেতা বা বিক্রেতা নয়, কাজের সন্ধানেও বহু মানুষ এই বাজার-সংলগ্ন এলাকায় ভিড় জমাতে শুরু করলেন। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিহার থেকে আসা শ্রমিকরা। যাঁরা খুব অল্প পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কঠিন পরিশ্রম করতে পারতেন। দীর্ঘদিন থাকতে থাকতে বর্তমানে তাঁরা কলকাতার চিরস্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছেন। শুধু তাই নয়। এক সময়ের সেই শ্রমিক সম্প্রদায়ের বংশধররা অনেকেই আজ সেখানকার মালিক হয়ে বসেছেন। আর যাঁরা আজকের বড়বাজার তৈরি করেছেন সেই বাঙালিরা ক্রমশ বাবু সম্প্রদায়ে উন্নীত হয়েছেন এবং বসে-খেয়ে তাঁদের পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া বিশাল ব্যবসা বা সম্পত্তি ধ্বংস করেছেন অথবা তাঁদের সেই বিহারি শ্রমিকদের হাতে তুলে দিয়েছেন। আর সেই বিহারি মালিকদের দোকানে এখন কাজ করতে যান কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বাঙালি শ্রমিকরা। এভাবেই মালিক ক্রমশ শ্রমিক হয়েছেন এবং শ্রমিকরা মালিক হয়েছেন। শুধু ব্যবসার মালিকানা পরিবর্তন নয়, বড়বাজার সহ কলকাতার বিস্তীর্ণ অঞ্চল এখন বিহারি সম্প্রদায়ের মানুষদের দখলে। তবে অবশ্য ব্যতিক্রমও রয়েছে। এখনও বহু বাঙালি ব্যবসায়ী তাঁদের সেই ঐতিহ্যবাহী ব্যবসা টিকিয়ে রেখেছেন। তবে বিভিন্ন দোকানের কর্মচারীরা বাঙালি হলেও শ্রমিকদের মধ্যে অধিকাংশই বিহারি সম্প্রদায়ের মানুষরাই রয়ে গেছেন। কারণ এই শ্রমিকরা যেভাবে পরিশ্রম করতে পারেন অন্য সম্প্রদায়ের মানুষরা তেমনটা করতে পারেন না বলেই প্রবাদ আছে। সেই সূত্রে বড়বাজার যত বড় হয়েছে ততই বেড়েছে বিহারবাসীদের বসবাস।

সেই বড়বাজার অবশ্য এসবের বাইরে অন্য নানা কারণে অনেকবার খবরের শিরোনামে এসেছে। প্রতি বছরই এখানকার কোথাও না কোথাও আগুন লাগে, আবার অনৈতিক নানা ব্যবসারও খবর পাওয়া যায় কখনও কখনও। এসবের পিছনে প্রশাসনের তরফে ঘনবসতিকে কারণ হিসাবে দেখানো হয়। এক-একটা বাড়িতে ব্যবসার কারণে ব্যাপক পরিমাণে দাহ্য পদার্থ মজুত রাখা হয়। কর ও ইনসিওরেন্স ফাঁকি দিতে এমনটা করা হয় বলে প্রশাসনের দাবি তবে এসবের ঊর্ধ্বে প্রশ্ন হল ঐতিহ্যবাহী বাজারে এমনটা হয় কেন? মুনাফার নেশায় ব্যবসা ক্রমশ বাড়লেও বড়বাজারের আয়তন কিন্তু বাড়েনি। বদলে বড়বাজারের এক-একটা জায়গা এক এক জিনিসের জন্য ক্রমশ চিহ্নিত হয়ে হয়েছে। কোথাও ফলপট্টি, কোথাও পোশাকের বাজার, কোথাও খাদ্যদ্রব্য। বলা হয় টাকা দিলে বড়বাজারে পাওয়া যায় না এমন কিছু নেই। এমনকী প্রবাদ আছে টাকা দিলে বড়বাজারে নাকি বাঘের দুধও পাওয়া যায়। কিন্তু এমন একটা বাজার কীভাবে ক্রমশ বাঙালিদের হাতছাড়া হচ্ছে? বদলে বিহারি ও মারোয়াড়ি সম্প্রদায়ের মানুষরা তার দখল নিচ্ছে এবং ক্রমশই তা নিয়ে চলেছে। কবি-সাহিত্যিকদের লেখনীতে বারবার উঠে এসেছে বাঙালিদের বাবুয়ানার কথা। সেই বাবুয়ানাই কি ধ্বংস করছে তাদের ঐতিহ্যকে? একদা বড়বাজারে এক মশলা ব্যবসায়ীর ছেলের সাথে কথা বলতে বলতে জানা গেল তিনি বর্তমানে রাজ্য সরকারের কর্মচারী। ঠাকুরদা বা বাবার সাথে কখনও কখনও ছোটবেলায় সেখানে এসেছিলেন, কিন্তু নিজে কখনও ব্যবসার গদিতে বসেননি। তাঁর মতে, অত পরিশ্রম নাকি তাঁর সইবে না। তার বদলে ফাঁকি দেওয়া সরকারি চাকরিই তাঁর ভালো... ব্যবসা করে বাবা যা রোজগার করতেন সরকারি চাকরি করে তিনি তাঁর অর্ধেকও রোজগার করেন না ঠিকই, কিন্তু ওই রোজগারে যখন তাঁর পরিবার নিয়ে চলে যাচ্ছে তখন আর অযথা বেশি পরিশ্রম করবেন কেন? হায় রে বাঙালি... কী অনায়াসেই না সে তাঁর সাদা লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলতে পারে তা এই মানুষটিকে না দেখলে হয়ত জানা হতো না। এমনকী কোটি টাকার সেই গুদামও বেদখল হয়ে গেছে। বেশ কয়েক পুরুষ ধরে চলে আসা সেই ব্যবসা পরিশ্রমের ভয়ে আনায়াসেই নিমেষে শেষ করে দিলেন তিনি। এমন একজন নয়, বড়বাজারে অনাচে-কানাচে খোঁজ করলে এমন বহু বিহারি বা মারোয়াড়ি ব্যবসায়ীর সন্ধান পাওয়া যাবে যাঁরা নামমাত্র টাকা দিয়ে কোনও বাঙালির থেকে সেই ব্যবসা বা দোকানের উত্তরাধিকার নিয়েছেন। বাঙালি ব্যবসায় আগ্রহী নয়– একথা সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু তা বলে নিজে হাতে তৈরি এমন সাম্রাজ্য নিজেই অন্যের হাতে তুলে দেওয়া যায়, সেটাও হয়তো একমাত্র বাঙালিদের দ্বারাই সম্ভব। অন্যদিকে পরিশ্রমের যে কোনও বিকল্প নেই সেটাও বর্তমান মালিক সম্প্রদায়ের থেকে শিক্ষণীয়। পরিশ্রম ও সঞ্চয় করে কীভাবে একটা বৃহৎ সাম্রাজ্যের দখল নিয়ে চলেছে এবং যে রোজগারের টাকা কলকাতা বা এই রাজ্যে থাকার কথা ছিল তা কত অনায়াসেই অন্য রাজ্যকে সমৃদ্ধ করছে সেটাই শেখার। অবশ্য শিখবে কারা যারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করতে পারে তারা কি শিখতে পারবে? নাকি হুঁশ ফিরবে এবং ঘুড়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করবে? এখনও যদি ঘুড়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করা যায়, বুদ্ধি ও পরিশ্রমের মাধ্যমে তা পুনরুদ্ধার করা হয়তো সম্ভব। এর এখনও যদি তা না হয় তাহলে অবশ্য অনেক দেরি হয়ে যাবে। ফলে বাঙালি তার নিজের অধিকার ফিরে পেতে ঘুরে দাঁড়াবে কিনা সেটা অবশ্য সময়ই বলবে।

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১০ এপ্রিল ২০১৭

কলকাতার কথ্যভাষা

কৃষ্ণগোপাল রায়

বাংলা এখন বিশ্বের সর্বাধিক কথিত ষষ্ঠ ভাষা। এর আগে রয়েছে চিনা, স্পেনীয়, ইংরেজি, হিন্দি ও আরবি। এই পাঁচটির সঙ্গে বাংলার একটি প্রাথমিক পার্থক্য আছে। পাঁচটি ভাষাই নিজস্ব বিস্তার ভূমিকায় অনেক ভাষাকে সাঙ্গীকৃত করে নিজেদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। যদিও সেইসব ভাষা বস্তুত তাদের উপভাষাও নয় সর্বক্ষেত্রে। চিনা ভাষাকে ভাষা তাত্ত্বিকেরা 'আসলে একটি ভাষা পরিবার' (আ হোল ফ্যামিলি অব ল্যাঙ্গুয়েজেস) বলেন, আরবিও কোরানের আদর্শে একটি লেখ্যরূপ, অন্তর্গত ভাষাগুলির মধ্যে যেমন ধরা যাক ওমান ও মরোক্কোর মধ্যে অতি দূরাবোধগম্য। ইংরেজির মধ্যেও সে পার্থক্য ক্রমশ বেড়ে চলেছে। মূলত আমেরিকার স্বাতন্ত্র্য, তাছাড়া নানা দেশের ইংরেজি সেখানকার ভাষার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে নানা ভাবে। হিন্দির অবস্থাও তাই। এর অভ্যন্তরে যে কত ভাষা সাঙ্গীকৃত হয়ে আছে, তার সঠিক হিসাব করাই কঠিন। বাংলা এর ব্যতিক্রম। 'বাংলা একটি ভাষা পরিবার নয়', একটি ভাষা। কামতাপুরী, সিলেটি, চট্টগ্রামীয় ইত্যাদি স্থানিক ভাষাগুলির যে পার্থক্য বাংলা তাদের সাঙ্গীকৃত করে বিকশিত হয়নি, বরং বাংলার উপভাষা হিসাবে তারাই নিজেদের প্রয়োজনে, অহরহ সাহায্য নিচ্ছে বাংলা থেকে।

ভাষা নিয়ে রাজনীতি খুব, রাজনীতি শিকার বরাবর হতে ভাষাকে। বাংলাও তার বাইরে নয়। একদা অসমিয়া বাংলা উপভাষা ছিল, আজ স্বতন্ত্র ভাষা, কামতাপুরী আন্দোলন চলছে। বাংলাদেশ বাংলাকে ভিন্ন চেহারা দেবার প্রচেষ্টা চলছে, এ বাংলায় বাংলা ভাষার উপর রয়েছে নানা চাপ। বাংলার শুদ্ধ গদ্যরূপ যখন গড়ে তোলার কাজ চলছিল তখন এইসব চাপ তো ছিল না, বরং কী করে এই ভাষাকে আদর্শ রূপ দান করা যায়, কী করে সমস্ত ব্যবহারিক কাজের উপযোগী করে তোলা যায়, তাই ছিল বাংলার ভাষা মনীষীদের মগ্ন সাধনা।

সেই সাধনা যখন চলছে, রামমোহন, রাজীবলোচন, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাম রাম বসু থেকে বিদ্যাসাগর, বঙ্গিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র থেকে সত্যেন্দ্রনাথ বসু মনীষা কর্ষণে, তখনও কলকাতার নিজস্ব বাচিক ভাষা ছিল। সাধারণভাবে তাকে 'কলকাতার ককনি' বলা হতো, কেমন ছিল সেই ককনির রূপতাত্ত্বিক ও ধনিতাত্ত্বিক রূপ, সেকালে তার আলোচনা হয়নি। একালে তার আলোচনায় সমস্যা হল, সেকালের লোক বেঁচে নেই বা তাদের কথা টেপ করা নেই যে তাদের ধ্বনিতাত্ত্বিক রূপের অধিক আকলন করা যাবে। এক্ষেত্রে অবলম্বন করতে হবে, সেকালের ককনি কথিত লেখাগুলো। কিন্তু নিখুঁত বাচিক রূপের উপস্থাপনা খুব মুশকিল। যাঁরা লেখেন তাঁরা শিক্ষিত, তাঁদের পক্ষে নিখুঁত ককনি লেখা কখনওই সম্ভব নয়, সতর্কতার চোরাপথেই বর্তে যায়, শিক্ষিতজনের কৃত্রিমতা।

ঈশ্বরগুপ্ত ছিলেন সাংবাদিক, তাছাড়া তিনি প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না, তবু তাঁর গদ্যে কলকাতার ককনি বা কথ্যভাষা, প্রাধান্য পায়নি। ব্রাহ্মরা রামমোহন বিশেষ করে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের রুচির দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এঁরা কেউ 'ককনি' বলতেন না, রুচিশীল এক স্বতন্ত্র ভাষা-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছিলেন এঁরা এবং সেই ভাষাতেই কথা বলতেন। 'হ্যানা বাংলা ভাষা জানতেন' কিন্তু সে বাংলা সাধুরই সরল রূপ, তাঁর মতো বিদেশিনী সন্ন্যাসিনীর কাছে কক্‌নি প্রত্যাশা করাও উচিত নয়।

সেকালের কলকাতার কথ্যভাষার প্রথম সাহিত্য পরিবেশনা 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'(১৮৪১)য়। এর আগে ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩), 'নববাবু বিলাস' (১৮২৫) রচনা করেছিলেন সমকালীন কলকাতার পটভূমিতে। যাপনিক ব্যস্ততা বইদুটিতে যথেষ্ট, দুটি বই-ই সাধুভাষায় লেখা। সেই অপরিণত সাধু মাঝে মাঝে সন্নিবেশিত হয়েছে, সমকালীন কথ্য। একটা উদাহরণ:

'দেখ স্বামীর এই দশা, তাহাতে আবার যদি গোপনে, এদিক ওদিক কোনদিক চাই, তখনই ঘরে পরে গুরুজনের গঞ্জনায় প্রাণ বাঁচে না, বাটীর রসুয়্যা ব্রাহ্মণ, কিংবা জলতোলা ভারী, অথবা কুটুম্ব লোকজন কাহারো সঙ্গে পিত্তরক্ষার নিমিত্ত আলাপ করিলে অভাগা মাগিগুলো কতই চায়, এত কি প্রাণে সয়, যেমন পাপিষ্ঠ ভাতার তেমন তার ভাত আর খাইব না।

তাহাতে বাটী, কুটুম্ব, পিত্তরক্ষা নিমিত্ত করিয়ে খাইব পাপিষ্ঠ, ইত্যাদি সর্বনাম, ক্রিয়া বা তৎসম পদের ব্যবহার থাকলেও কথার ছাঁদটি সেকালের কথ্যের। লক্ষ করার যে, মাগি, ভাতার ইত্যাদি শব্দগুলো তখনও 'স্ল্যাং' বা অশ্লীল হয়নি, পাপিষ্ঠার মতো তৎসমের পরেই 'ভাতারের' মতো অশালীন কথ্যের ব্যবহারেও বাচিক ভাষার বৈশিষ্ট্য।

সাধুর কাঠামো ছিল বলে এই ভাষা নিয়ে তত উচ্চবাচ্য হয়নি। কিন্তু' হুতোমে' কালীপ্রসন্ন সিংহ যখন লিখলেন:

'সন্ধ্যা হয় হয় হয়েছে, গয়লারা দুধের হাঁড়া কাঁদে করে দোকানে যাচ্ছে, মেচুনীরে আপনাদের পাটা, বটি ও চুবড়ি, ধুয়ে প্রদীপ সাজাচ্চে। গ্যাসের আলো জ্বালা মুটেরা মই কাঁদে করে দৌড়াচ্ছে— খানার সামনে পাহারাওয়ালাদের প্যারেড (এরা লড়াই করবেন, কিন্তু মাতাল ছেলে ভয় পান), হয়ে গিয়েছে। ব্যাঙ্কের ভেতো কেরানীরে ছুটি পেয়েছেন।'

ভবানীচরণের 'এদিক ওদিক কোনদিক'-এর মতো এখানেও 'সন্ধ্যা হয় হয়, কলকাতা কথ্যের নিজস্ব বাগধারা, এখনও যা ব্যবহারে আছে, ইংরেজি শিক্ষা শুরু হয়ে গেছে কথ্যে তাই ইংরেজি শব্দের মিশ্রণ ঘটেছে বহুল পরিমাণে 'স্ল্যাং' শব্দ শুরু করেছে। বিলাসী হচ্ছে 'বাঙালি, ভাষায় তার প্রভাব পড়ছে, অল্পপ্রাণীভবনের প্রভাব বেড়েছে পরিমাণ বেড়েছে দ্রুত, ছ হয়েছে চ, হয়েচে, দৌড়চে, সাজচে, পেয়েচেন, মেচুনী। গতি ফিরছে মিষ্টত্বভবনের দিকে— দৌড়াচ্ছে, হচ্ছে দৌড়ুচ্চে, মেছুনীরে, গোয়ালারা হচ্ছে গয়লারা। বহুবচনে 'রা আছে, তবে 'রে-ও হচ্ছে মিষ্টত্বের টানে। 'মেচুনীরে' 'কেরানীরে'। হিন্দুস্থানীয়রা আসতে শুরু করেছে, কলকাতায়-তাই 'মুটে' শব্দটি পাওয়া যাচ্ছে। আগে এদের বলা হত কুলি। এবার আরও দু-একটি উদাহরণ নিয়ে, মধ্যউনিশ শতকী কলকাতা-ককনির স্বরূপ লক্ষ্য করি,

১. বকা ধার্ম্মিকের শরীরটি মুচির কুকুরের মতো, নাদুরনাদুর ভুঁড়িটি, বিলাতী কুমড়োর মতো, মাতায় কামানো চৈতন ফক্কা ঝুঁটি করে বাঁদা-গলায় মালা ও ছোটো চাকের মতো গুটিকয়েক সোনার মাদুলি-হাতে ইষ্টিকবচ-চুলে ও গোঁপে কলপ দেওয়া কালাপেড়ে ধুতি, রামজামা ও জরির বাঁকা তাজ, গত বছর আশি পেরিয়েছেন অঙ্গত্রিভঙ্গ। কিন্তু প্রাণ হামাগুড়ি দিচ্চে।'

২. 'মা, বিদ্যেসাগর বেঁচে থাক, তোমার ভয় কি? ও ওল্ড ফুল মরে যাক না কেন, ওকে আমরা চাইনি, এবারে মা এমন বাবা এনে দেবো যে, তুমি, বাবা ও আমি, একত্রে তিনজনে বসে হেলথ (ড্রিঙ্কস) করণে, ও ওল্ড ফুল মরে যাক। আমি কোয়াইট রিফমর্ড বাবা চাই।'

৩. ক্রমে আমরা পাঠশালা ছাড়লেম, কলেজে ভর্তি হলেম, সহাধ্যায়ী দু-চার সমকক্ষ বড় মানুষের ছেলের মঞ্চে আলাপ হল, একদিন আমরা একটার সময় গোলাদীঘির মাঠে ফড়িং ধরে খ্যালা করে বেড়াচ্চি, এমন সময় আমাদের কেলাসের পণ্ডিত সেদিকে বেড়াতে এলেন।'

কলকাতার ককনি 'হুতোমের' চেয়ে যথাযথ আর কোথাও পাওয়া যায় না। এভাষার স্বতন্ত্র্য মাদকতা আছে, আছে নিজস্ব সৌন্দর্যও, কিন্তু বাংলার প্রধান কবি সাহিত্যিকেরা এ ভাষায় উন্নতমান সাহিত্য রচনা করা যাবে মনে করলেন না। মধুসূদন একে 'ল্যাঙ্গোয়েজ অব ফিশারওমেন' মনে করলেন, বিদ্যাসাগর থেকে বঙ্কিম কেউ গুরুত্ব দিলেন না এই ককনিকে, আর তাতেই সাহিত্যের বা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে লেখ্য, গদ্য হুতোমী ভাষা থেকে স্বতন্ত্র পথে এগোল। 'আলালের ঘরের দুলাল'-এই দেখা যাচ্ছে সেই পরিবর্তন। লেখকের কলম সাধুতে সাধা চরিত্রের সংলাপে ককনির প্রভাব থাকলেও ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম সাধুর অবশ্য গুরুচণ্ডালিকা আছে। একটা উদাহরণ:

'বাঞ্ছারাম অমনি রেগেমেগে থমকি উঠিয়া বলিলেন, ছোটলোকের মতই স্বতন্তর, এরা ভালো কথার কেউ নয়, নাতি ঝেঁটা না হলে জব্দ হয় না। লোকে তল্লাশ করিয়া দিল্লি যাইতেছে, বৈদ্যবাটী গিয়া, একটা কর্মনিকেশ করিয়া আসিতে পার না? সাকুব হইলে ইশারায়, বুঝে তোকে চোকে আঙুল দিয়া বললুম তাহাতেও হোঁশ হইল না?

অল্পপ্রাণীভবনের যে প্রাবল্য ককনিতে ছিল তা কমতে শুরু করেছে, (কথা), কিন্তু আছেও(চোকে, নাতি), ল-ন-এ পরিবর্তন হচ্ছে , পদবি যুক্তবর্ণ ভেঙে যাচ্ছে,(স্বতন্তর) আবার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, (কর্ম, বৈদ্যবাটী), আরবি, ফারসির ব্যবহার, খানিকটা এখানে বেশি দেখাচ্ছে বাঞ্ছারাম উকিলের কেরানি বলে। আরেকটা নতুন জিনিস এখানে দেখা যাচ্ছে, 'লুম' প্রত্যয়ের ব্যবহার(বললুম), হুতোমে' পেয়েছিলাম, 'লেম' (ছাড়লেম, হলেম)। এই 'লুম' ও 'লেম' গ্রহণীয়তার প্রশ্ন ফল্গুধারার মতো টিকে ছিল, আরও নিদেন ৬০ বছর, ১৯১৪ তেও রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আমি এলেম, কাঁপল তোমার বুক / আমি এলেম এল তোমার দুখ।'গদ্যে তিনি আবার ক্রমাগত 'লুম'-এর ব্যবহার করে গেছেন। শেষ পর্যন্ত দুই-এর কোনটাই অবশ্য টেকেনি, পূর্ববঙ্গের জনজোয়ারে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, বাঙালির উপভাষার 'লাম', (বললাম, এলাম, দেখলাম)।

সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পর থেকে কলকাতার ককনির সাহিত্য ব্যবহার একেবারেই কমে গেছে, তিনি নিজে তো ব্যবহার করেননি। তবে মাইকেল-দীনবন্ধু প্রমুখের প্রহসনের সংলাপে ব্যবহার থেকে গেছে, যদিও এরা হুতোমী ভাষার বিরোধীই ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আরও শব্দসূচিবায়ুগ্রস্ত, তাঁর প্রহসনেও ককনি নেই। কলকাতার প্রকৃত বাংলা তাঁর অতি অভিজাত রুচিতে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। কিন্তু একই সময় বিবেকানন্দ অনর্গল ব্যবহার করেছেন কলকাতার নিজস্ব কথ্যভাষা। একটা উদ্ধৃতি—

'ধনী হওয়া, আর কুঁড়ের বাদশা হওয়া, দেশে এক কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেটা লুচির ফুলকো ছিঁড়ে খাচ্ছে, সেটাতো মরে আছে। যার দুপয়সা আছে, আমাদের দেশে, সে ছেলেপিলেগুলোকে নিত্য কচুরি মণ্ডা মিঠাই খাওয়াচ্ছেন।। ভাত রুটি খাওয়া অপমান।। এতে ছেলে পিলেগুলো নড়েভোলা পেটমোটা আসল জানোয়ার হবে না তো কি? এত বড় ষণ্ডা

জাত ইংরেজ, এরা ভাজাভুজি মেঠাইমণ্ডার নামে ভয় খায় আর আমাদের আবদার লুচি কচুরি, মেঠাই, ঘিয়েভাজা, তেলেভাজা। সেকেলে পাড়াগেঁয়ে জমিদার এক কথায় দশক্রোশ হেঁটে দিত তাদের ছেলেপিলেগুলো কলকেতায় আসে, চশমা চোখে দেয়, লুচি কচুরি খায়, দিনরাত গাড়ি চড়ে, আর প্রস্রাবের ব্যামো হয়ে মরে। কলকেত্তাই হওয়ার এই ফল। ভাষা ব্যক্তিত্বের আপেক্ষিক, বিবেকানন্দের পৌরুষ নিহিত আছে তাঁর এই গদ্যে। কিন্তু তাহলেও স্পষ্ট য়ে হুতোমের পরবর্তী পঞ্চাশ-ষাট বছরের মধ্যে কলকাতার মধ্যে ককনির বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেছে। 'হুতোমী' ব্যসন আর ঢিলে চাল আর নেই, ইংরেজি, আরবি, ফারসির অহেতুক মিশেল থেকে তা মুক্ত হয়ে গেছে। স্বাভিমানে, গতিময়তায় পেয়েছে সে প্রাণ সম্পদ। সারা ভারতের রাজধানী কলকাতা, নানা রাজ্যের মানুষের অভ্যাগমে নানা ভাষার সংশ্রবে এসেছে তার ভাষা। ইংরেজি তো সকল কাজ কর্মেরই মাধ্যম, তবুও এমন আশ্চর্য বিকাশ কলকাতা কথ্যের।

এরপর ছয়ের পাতায়

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ১০ এপ্রিল ২০১৭

কলকাতার কথ্যভাষা

পাঁচের পাতার পর

এই বিকাশের নেপথ্যে কাজ করে থাকবে তার স্বাজাত্যাভিমান, ১৯১১ তে যা ধাক্কা খেল প্রথম এবং ১৯৪৭ পর যা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। রবীন্দ্রনাথ থেকে জগদীশচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ বসু ভাষা সম্পর্কিত যে স্বপ্ন ও বিশ্বাস জাগিয়ে রেখেছিলেন, বাঙালি কবি সাহিত্যিকেরা তার কিয়দংশে ধরে রেখেছিলেন গত শতাব্দীর আটের দশক অবধি। এরপর সাহিত্যের সঙ্গেও কলকাতার বাঙালির সম্পর্ক ছিন্ন হল। সাহিত্য হল কেবল সংশ্লিষ্টদের বিষয়। ভাষাপ্রীতি হয়ে গেল কেবল কথার কথা। এবং প্রীতির অভাবেই ২১ শতকের কলকাতা প্রাণময় কোনও নিজস্ব কথ্য ভাষা নেই। ইংরেজি বলে পৃথিবী কাঁপিয়ে এসেও ঔইরকম বাংলা বলা যায়– লেখা যায়, এবং সেটাই যে জাতির পক্ষে-নিজের পক্ষে নিতান্ত দরকার, ঘরে ঘরে বিবেকানন্দের ছবি টাঙিয়ে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে মর্মর মূর্তি বানিয়ে, ফেসবুকের পাতায় তাঁর রাশি উদ্ধৃতি ব্যবহার করেও বস্তুত কলকাতার বাঙালি তা ভুলে গেছে। এখানে এখন দুই শিক্ষিত যুবক নিজেদের মধ্যে হিন্দি বা ইংরেজিতে কথা বলতে লজ্জা পায় না, হিন্দি ইংরেজি না মিশিয়ে মাতৃভাষা বলতে পারে না, বাংলায় কাঁচা হলে গৌরববোধ করে। এদের কথ্যভাষা কী?

একটা স্বরূপ নিশ্চয় পাওয়া যাবে, আজকের কলকাতা কথ্যের তা নিয়ে ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা হতেও কোনও বাধা নেই। কিন্তু তার নিষ্কর্ষ কোনও শ্লাঘার ছবি দেখাবে না।

লেখক চাপরা বাঙালঝি মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ

ব্যক্তিত্ব @ কলকাতা

১২০তম জন্মদিনে যামিনী রায়

নীলাঞ্জন

‘গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ, আমার মন ভুলায় রে’– লাল রঙা মেঠো পথ দিয়ে যেতে গেলেই রবি ঠাকুরের কথা মনে পড়ে। গ্রামের মানুষগুলির কী সহজ-সরল নিরাভরণ জীবনযাত্রা। শহুরে আমরা বেশিরভাগই গ্রাম্যজীবনে দু-পাঁচদিনেই হাঁপিয়ে উঠি। তবু যেন কীসের টানে বারে বারে ফিরে ফিরে যাই। না না, বীরভূম নয়, বাঁকুড়া। সেও লালমাটির জেলা। চারুশিল্পই এখানকার মানুষের পরিচয়। বড় চাকায় একতাল মাটি, সঙ্গে হাতের কেরামতি– জন্ম নিচ্ছে অনন্য শিল্প। টেরাকোটা। বিষ্ণুপুরী পুতুল। শুকনো কাঠ প্রাণ পেয়ে হয়ে উঠছে ঘোড়া, হাতি। সুতোর কাজে রূপ পাচ্ছে বালুচরি শাড়ি। সেই সঙ্গে লোকগানের সুর তো রয়েইছে। ‘তারে ধরি ধরি, মনে করি, ধরতে গেলে আর পেলে না।’ জ্ঞানবন্দি করতে চলেছি বেলিয়াতোড় গ্রামে। প্রশ্ন উঠতে পারে কীসের জ্ঞান?

যামিনী রায় নামের জ্ঞানভাণ্ডার জন্ম নিয়েছিলেন এই গ্রামে। হ্যাঁ, চিত্রশিল্পী যামিনী রায়। ছোটবেলা থেকেই দেশজ শিল্পের প্রতি তাঁর ঝোঁক। তাই বাবা রামারতন রায় ছেলেকে পাঠালেন কলকাতায়। ভর্তি হলেন কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখনকার ভাইস প্রিন্সিপাল। পাশ্চাত্য চিত্রকলার শৈল্পিক পদ্ধতি সম্বন্ধে পড়াশোনা করলেও দেশজ আর্ট-ই তাঁর তুলিতে নানাভাবে উঠে এসেছে। গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের পাঠ শেষ করে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন পাশ্চাত্যের শিল্পকলার অনুকরণে কাজ করবেন না। তার জায়গায় বাংলার লোক সংস্কৃতি, ট্রাইবাল আর্টকে তিনি ফুটিয়ে তুলতে চান তাঁর ভাবনার মধ্যে। সবথেকে বেশি অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন কালীঘাট পটচিত্র থেকে। দেব-দেবীর ছবি যুক্ত রংবেরঙের এইসব পট তাঁর শিল্পকর্মের মূল ভিত তৈরি করে দিয়েছিল।

১৯২১ থেকে ১৯২৪ সালের মধ্যে সাঁওতাল নৃত্যশৈলী নিয়ে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন তাঁর ছবিতে। প্রথমদিকে পোর্ট্রেট পেইন্টিংকে তিনি জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তাঁর ছবির বিষয় বস্তু এবং অঙ্কনশৈলী সমাজের এক বড় অংশকে চিত্রকলা সম্পর্কে ভাবতে সাহায্য করে আজও। ১৯৩৮ সালে প্রথম, কলকাতার ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিটে যামিনী রায়ের ছবি নিয়ে প্রদর্শনী আয়োজিত হয়েছিল। এরপর ১৯৫৩ সালে লন্ডন এবং নিউ ইয়র্কে এই বিশেষ আঙ্কিক প্রদর্শিত হয় এবং প্রশংসা লাভ করে। নিজের ছবিতে অত্যন্ত সচেতন ভাবে পোটদের

শৈলীকে তিনি মেলে ধরতেন এবং নিজেকেও বাংলা শিল্পকর্মের একজন পটুয়া বলে পরিচয় দিতে ভালোবাসতেন।

তৎকালীন ‘স্টেটসম্যান’ পত্রিকার সম্পাদক স্যার অ্যালফার্ড ওয়াটসন বলেছিলেন, যামিনী রায়ের লোকশিল্প বিষয়ের শিল্পকর্মগুলিকে গভীরভাবে দেখলে শিল্পীর ছবির বিভিন্ন অধ্যায়ের বিবর্তনটি খুব সহজেই চোখে পড়ে। তাঁর উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্মগুলির মধ্যে রয়েছে, গোপিনী সিরিজ, কৃষ্ণ বলরাম, গণেশ জননী, বেড়ালের মুখে মাছ, বৈষ্ণব, যুদ্ধরত রাজা, তিন বোন ইত্যাদি। তাঁর শিল্পের স্বীকৃতি স্বরূপ জীবনের প্রথম প্রদর্শনীর চার বছর আগে ১৯০৪ সালে পেয়েছিলেন তৎকালীন ভাইসরয় প্রদত্ত স্বর্ণপদক। ললিত কলা অ্যাকাডেমির পথ ফেলো যামিনী রায়কে ভারত সরকার পদ্মভূষণ দিয়ে সম্মানিত করেন। ১৯৭৬ সালে ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীনে থাকা আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া যামিনী রায়কে দেশের নবরত্নের অন্যতম শিল্পী হিসাবে স্বীকৃতি দেন।

তাঁর ছবি আঁকার মাধ্যম অয়েল এবং টেম্পারায়। জলরঙের কাজের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। ছবির বিষয় বস্তুর প্রধান দাবী ছিল বৈচিত্রময় রং। তাই শিল্পীর বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করত তাঁরই নির্বাচিত বিভিন্ন রকম রঙের প্রলেপ, যার মধ্যে বেশিরভাগ সময়ই ব্যবহৃত হতো চন্দন গুঁড়ো, নীল, চকের গুঁড়ো, ভেষজ রং ইত্যাদি। এই সব ব্যবহারের মাধ্যমেই তাঁর জনপ্রিয় কাজগুলি জন্ম নিয়েছে। তাঁর সব কাজের মাঝেই রেখায়-রঙে ফুটে উঠেছে শুধুই সাধারণ মানুষের মুখ। এই সাধারণ মানুষের মুখের মধ্যেই আজও জীবন্ত হয়ে আছেন শিল্পী। আজও অভিজাত, সম্ভ্রান্ত বাড়ির ড্রইংরুমের মান বাড়িয়ে চলেছে যামিনী রায় এবং তাঁর শিল্পকর্ম।

পুরনো বাড়ি @ কলকাতা

আমপোস্তা থেকে আলুপোস্তা

মনীষা ভট্টাচার্য

দাদা বলতে পারেন পোস্তা কোথায়?

ক্যায়া-য়া-য়া? পোস্ত?

না না, পোস্তো নয়, পোস্তা, কোথায়? কীভাবে যাব?

পোস্তো? যাবেন কেন? উও যো খাতা হ্যায়। আলুপোস্ত, ঝিঙেপোস্ত...

ওরে বাবারে....নাহ, পোস্তা পোস্তো হয়ে যাচ্ছে...কী করি? সুকুরাম রায়ই ভরসা...‘শুনতে পেলুম পোস্তা গিয়ে, তোমার নাকি ছেলের বিয়ে, গঙ্গারামকে পাত্র পেলে, জানতে চাও সে কেমন ছেলে?’ নাহ্, কেমন ছেলে জেনে লাভ নেই, আপাতত পোস্তা রাজবাড়ির খোঁজ করি। আসলে বড়বাজার খুব কাছে বলে, এই অঞ্চলও অবাঙালিতে ভরে গেছে। তাই হয়তো আমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারছেন না। ফ্লাইওভার ভেঙে পড়ে সম্প্রতি এই পোস্তা মিডিয়ার নজরে এসেছিল। সেই পোস্তার রাজবাড়ির কথা বলতে চাই আপনাদের।

এখন আর তেমন জৌলুস নেই, আসলে সে রাজাও নেই, রাজত্বও নেই। তাই আলাদা করে চিনতে পারা যায় না কোনটি ঠিক রাজবাড়ি। এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে জানা গেল হুগলি নদীর পোস্তাঘাটের নামানুসারে এই অঞ্চলের নাম পোস্তা। আগে গঙ্গা খুবই কাছে ছিল, এখন অনেকটাই সরে গেছে। এখনের মতো আগেও এই অঞ্চল ছিল ব্যবসায়ী অধ্যুষিত, বিশেষ করে ব্যাংকারদের বসবাস ছিল। এঁদের ঐশ্বর্য ও ধন-সম্পত্তি ছিল উল্লেখযোগ্য। এঁদেরই মধ্যে অন্যতম লক্ষ্মীকান্ত ধর, তিনি ছিলেন তৎকালীন ব্রিটিশদের ব্যাংকার। এই লক্ষ্মীকান্ত ধরের দৌহিত্র সুখময় রায় হলেন আজকের পোস্তা রাজবাড়ির প্রতিষ্ঠাতা।

শোনা যায়, ইংরেজরা লক্ষ্মীকান্তকে ‘রাজা’ উপাধি দিতে চাইলে তিনি তাঁর দৌহিত্রকে সেই উপাধি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। ইংরেজরা সেইমতো সুখময়কে ‘রাজা’ সম্বোধনে ভূষিত করেন। লক্ষ্মীকান্ত নিজে খুব ধনশালী ছিলেন, কিন্তু তাঁর পুত্রসন্তান ছিল না। একটি কন্যাসন্তানকেই মানুষ করেছিলেন এবং তাঁরই মতো ধনশালী ব্যক্তির ঘরে বিবাহ দিয়েছিলেন। তবে জামাইকে তিনি ঘরজামাই করেই রেখেছিলেন। সুখময় বাবার এবং দাদামশায়ের সম্পত্তির অধিকার পেয়ে হয়ে উঠলেন ধনকুবের। বর্তমান নানা সংস্কারের কারণে এই বাড়ির কিছু অংশ নষ্ট হলেও এখনও আছে প্রাচীন তিনটি বাড়ি। রাজবাড়ি, লালবাড়ি ও ঠাকুরবাড়ি। এই লালবাড়ির সাহেবি আমলের স্থাপত্যকলা আজও অনেকটাই টিকে আছে। এই বাড়ি নির্মিত হয়েছিল ১৯১১ সালে।

এবার একটু বলি সুখময়ের দাদামশায় লক্ষ্মীকান্ত যিনি নকু ধর নামেই বেশি পরিচিত, তাঁর কথা। তিনি বাংলার ইতিহাসে এক বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি সেই সময়ের অন্যতম ধনকুবের ছিলেন। ইংরেজরা প্রয়োজনে তাঁর কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিতেন। সেই সূত্রে অনেক সাহেবের সঙ্গে নকু ধরের পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ। শোনা যায় নবকৃষ্ণ দেব একবার চাকরির খোঁজে তাঁর কাছে এসেছিলেন। সেই সময় নকু ধর নবকৃষ্ণকে নিয়ে গিয়েছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসের কাছে। সাহেব নবকৃষ্ণকে তাঁর ফারসি শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। এর পরের ইতিহাস হয়তো সবারই জানা। হেস্টিংস, ক্লাইভ প্রমুখের আনুকূল্যে নবকৃষ্ণ শুধু ‘মহারাজা’-ই হননি, পেয়েছিলেন পাঁচহাজারি মনসবদারি।

২০১৭ সালের ইতিহাসে দাঁড়িয়ে নকু ধর অপরিচিত একটি নাম। তবে পোস্তা রাজবাড়িটি এখনও আছে। পরিবর্তনও হয়েছে অনেক। এক সময় পোস্তাকে বলা হতো আমপোস্তা, কারণ তখন এখানে জমজমাট আমের বাজার বসত। এখন অবশ্য পোস্তাকে বলা হয় আলুপোস্তা। আলু, পেঁয়াজ, রসুন, আদা ও নানা রকম মশলার বাজার বসে এখানে। তাই কিছুক্ষণ থাকার পরই নাক ধাঁধিয়ে যায়। এই আলুপোস্তার পাশে রয়েছে ডালের বাজার, তাই নাম ডালপোস্তা। সারা পশ্চিমবাংলা তো বটেই, পূর্ব ও মধ্য ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেও এখান থেকেই ডাল রপ্তানি হয়। আগে গঙ্গার ঘাটেই বসত বাজার। কথা বলে জানতে পারলাম, আগে যখন আমপোস্তা নাম ছিল, তখন অনেক বাবুরাই ঘোড়ার গাড়ি করে এক ঝুড়ি আম কিনতে আসতেন এই পোস্তায়। আরও জানা গেল এখানেই শোভারাম বসাকের তৈরি জগন্নাথের মন্দিরের পাশ দিয়েই বয়ে যেত গঙ্গা।

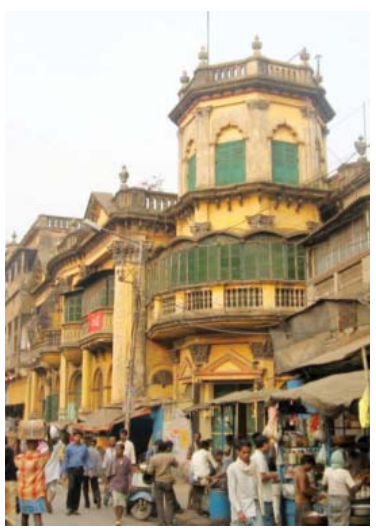

সুখময় রায় পুরীর মন্দিরে জগন্নাথ দর্শনে যেতে তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য কটক থেকে পুরী পর্যন্ত রাস্তা তৈরি করে দিয়েছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন উলুবেড়িয়া থেকে পুরী পর্যন্ত রাস্তা তৈরি করে দিয়েছিলেন তিনি। আসলে সুখরাম ছিলেন অত্যন্ত মানবদরদি মানুষ। সমাজের কল্যাণে তিনি প্রচুর অর্থই ব্যয় করেছেন। নকু ধরের দৌহিত্র প্রতিষ্ঠিত এই রাজবংশে এক সময় ব্যাংকারের কাজ করেছেন। ব্রিটিশ আমলের আগে ভারতের নানা জায়গায় এঁদের অফিস ছিল। ব্যবসায়ীরা সেই সব অফিসে টাকা জমা রাখতেন। ইংরেজদের সময় এঁদের পদোন্নতি হল, এঁরা হলেন জমিদার। তারকেশ্বর, কলকাতায় এঁদের কয়েক হাজার বিঘে জমি ছিল। তবে বর্তমানে সেই কৌলিন্য আর নেই। তবু মলিনতার মাঝেই এক সময়ের আভিজাত্য উঁকি মেরে যায় আজও। জানা গেল ডাক ব্যবস্থা হিসাবে নবাব-বাদশাদের কাছে তাঁদের পরিবারকে বিশেষ সিলমোহর দেওয়া হয়েছিল। চিঠিপত্র পাঠানোর জন্য বিশ্বস্ত ব্যক্তিদেরই শুধু ওই সিলমোহরের ছাপ দেওয়ার রীতি ছিল। ডাকটিকিটের জায়গায় পড়ত ওই সিলমোহর।

জব চার্নক যে কলকাতার স্বপ্ন দেখেছিলেন কিন্তু বাস্তবে যা দেখে যেতে পারেননি, সেই কলকাতা অনেকটা আজকের কলকাতার সঙ্গে মেলে। তিনি সেই সময়ের বাংলার মধ্যে বাণিজ্যের যে সম্ভাবনা দেখেছিলেন তা ভুল নয়, বরং সত্যি বলেই প্রমাণিত। সেই বাংলার ধনৈশ্বর্যের তালিকায় এই নকু ধরের নামও ছিল। বংলার সংস্কৃতির সঙ্গে পশ্চিমি ধারা মিশে যে রেনেসাঁস এসেছিল তখন, তারই কিছু নির্দশন স্বরূপ থেকে গেছে আজও পলেস্তরা খসে যাওয়া এই সব রাজবাড়ি।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
সোমবার, ১০ এপ্রিল ২০১৭

স্টুডিও @ কলকাতা

ডাক্তারের অভিনেত্রী

শৈবাল পত্রনবীশ

পর্ব: সাত

নিউ থিয়েটার্সের কথা বলতে গেলে সেই যুগের বিখ্যাত সব অভিনেতা-অভিনেত্রী, ক্যামেরাম্যান, পরিচালক, সংগীতশিল্পী, সংগীত পরিচালক এবং কলাকুশলীদের কথা খুব সহজেই মনে পড়ে। এঁদের মধ্যে অন্যতম গুণী ও সুদক্ষ অভিনেত্রী ছিলেন ভারতী দেবী। তাঁর অভিনয় জীবন শুরুই হয়েছিল নিউ থিয়েটার্স থেকে। বি এন সরকার সব সময় নতুন শিল্পীদর সুযোগ দিতেন। ভারতী দেবী যখন অভিনয়ের কাজে সুযোগ পাওয়ার আশা নিয়ে স্টুডিওতে আসেন, তখন তাঁর স্ক্রিনটেস্টের জন্য ছবি তুলেছিলেন বিমল রায়। সেই সময়ের একটা মজার ঘটনার কথা জানাই। নিউ থিয়েটার্সে 'কাশীনাথ' ছবির শুটিং চলছিল। পরিচালক ছিলেন নীতিন বসু। এই ছবির এক উল্লেখযোগ্য বিষয় হল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী বেলা মুখোপাধ্যায় ছবিতে অনেকগুলি গান গেয়েছিলেন। গানগুলি সেই সময় ভীষণভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করে। দুটো শটের মাঝখানে যখন বিরতি চলছে তখন দেখা গেল নায়িকাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে লাইন অন হয়ে গেছে। খোঁজ খোঁজ, অবশেষে দেখা গেল এক আম গাছের তলায় একজোড়া মেয়েদের চটি। গাছের মগডালে বসে নায়িকা। নায়িকা কে, অনুমান করতে পারছেন কি? তখনকার বিখ্যাত নায়িকা, ভারতী দেবী। গাছের উপরে বসে অন্যমনস্কভাবে একটার পর একটা আম খেয়ে চলেছেন। ডাকাডাকির পরে খুব সাবধানে নেমে

এলেন গাছ থেকে। গোটা স্টুডিওর সবাই তখন ওখানে হাজির হয়েছেন। পরিচালক নীতিন বসু এসে নবাগতা নায়িকাকে বোঝালেন যে এভাবে শট ছেড়ে যেতে নেই, কারণ ইউনিটের এতগুলো লোক ওর জন্য অপেক্ষা করছেন। যাই হোক, শুটিং আবার নতুন করে শুরু হল।

বিকেলে সরকার সাহেব স্টুডিওতে এলে তাঁকে ঘটনাটা জানানো হয়। সাহেব স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমাতে শুনলেন। একটু যেন গম্ভীর। এদিকে সন্ধ্যায় শুটিং শেষ করে ভারতী দেবী গাড়িতে উঠছেন, দেখলেন গাড়ির এক কোণে এক ঝুড়ি আম রাখা রয়েছে। হঠাৎ বেয়ারা এসে বললেন সাহেব ডাকছেন। ভারতী দেবী তো ভয়ে কাটা। সাহেব শুধু বললেন, 'আম খাওয়ার জন্য গাছে ওঠার দরকার নেই। তোমার সামনে এত ভালো ভবিষ্যৎ, কোনও অঘটন ঘটলে তোমার কেরিয়ারটাই তো নষ্ট হয়ে যাবে।' এই ঘটনার পরে ভারতী দেবীকে কোনওদিনও আর গাছে উঠতে দেখা যায়নি। কানন দেবীর নাম, খ্যাতি যশ, যখন মধ্যগগনে সেসময় অনেক শিল্পীকেই নিউ থিয়েটার্সে আসতে দেখা যেত। তার মধ্যে ভারতী দেবীও ছিলেন। তিনি স্কুল জীবনে নিয়মিত কানন দেবীর ছবি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতেন। সেই সময়েই একদিন ঠিক করে ফেলেন যে তিনিও ছবিতে অভিনয় করবেন।

সোজা চলে এলেন স্টুডিওতে, সুযোগও পেয়ে গেলেন। প্রথম ছবি 'ডাক্তার'। তাঁর বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন জ্যোতিপ্রকাশ। ছবিতে অসাধারণ গান গেয়েছিলেন পঙ্কজ মল্লিক। পরিচালক ছিলেন ফণি মজুমদার। এরপরে কাজ করলেন 'ওয়াপস' ছবিতে। এই ছবিতে ভারতী দেবীর অভিনয় দক্ষতা এবং সুনাম সারা ভারতে ছড়িয়ে পরে। নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গে ক্রমে ভারতী দেবীর এক সুসম্পর্ক তৈরি হয়। তিনি এনটিকে মনে করতেন নিজের ঘর-বাড়ি। একটা সময় যখন অনেকেই নিউ থিয়েটার্স ছেড়ে বোম্বের দিকে পা বাড়াচ্ছিলেন তখন ওঁর কাছেও ভালো অফার ছিল। তখনও কিন্তু এনটির সঙ্গে ওঁর চুক্তি শেষ হয়ে যায়নি। সরকার সাহেব এ কথা জানতেন। তিনি ভারতী দেবীকে একদিন ডেকে বললেন, 'তুমি ইচ্ছে করলে নিশ্চয়ই বোম্বে যেতে পারো, কনট্র্যাক্টের কথা ভাবতে হবে না। ওখানে গেলে পারিশ্রমিক অনেক বেশি পাবে।' প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি যে এনটিতে ভারতী দেবী সে যুগে মাসে পাঁচ হাজার টাকা মাইনে পেতেন আর বোম্বে যাওয়ার জন্য ওঁর কাছে পনেরো হাজার টাকা মাইনের অফার ছিল। উত্তরে ভারতী দেবী বলেছিলেন, 'আমার কর্ম জীবন শুরু এনটিতে। তাছাড়া এখানে আপনার মতো একজন অভিভাবককে পেয়েছি। বেশি টাকার লোভে আমি কিছুতেই এনটি ছেড়ে বম্বে যেতে পারব না।' শেষ পর্যন্ত তিনি যাননি। পরবর্তীকালে তাঁর অভিনয় জীবন নিয়ে স্মৃতিচারণ করতে গেলে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করতেন বি এন সরকারকে।

গঙ্গার ঘাট @ কলকাতা

আর্মেনিয়ান ও মল্লিকঘাট

নীহারিকা

গঙ্গার স্পর্শ পাওয়ার জন্য, স্নান করে সর্বপাপ ধুয়ে ফেলার জন্য পুণ্যবারি সঞ্চয়ের জন্য এই শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর তীরে কতই না ঘাট তৈরি করা হয়েছে ব্রিটিশ রাজত্বের সময় থেকে আজ পর্যন্ত। প্রত্যেকটির একেকটি নাম ও ইতিহাস। এছাড়া ঘাটের কথার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে হরেকরকম অজানা-অকথিত কাহিনি। সেগুলোর কোনওটা সত্যি আবার কোনওটা কাল্পনিক। আজ আমার গন্তব্য প্রথমে আর্মেনিয়ান ঘাট এবং পরে মল্লিকঘাট। ইংরেজ আমলে ১৮৫৪ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে তাদের টিকিট কাউন্টার খুলেছিলেন এই ঘাটের কাছেই। মনে করা হয় এর কিছুদিন আগে ঘাটটি তৈরি করা হয়েছিল। ঘোড়ায় টানা ট্রামে যাত্রীরা আসতেন শিয়ালদহ রেলস্টেশন থেকে আর্মেনিয়ান ঘাট পর্যন্ত। বলা যায় এক অর্থে হাওড়া এবং শিয়ালদহের মধ্যে যাতায়াতকারী যাত্রী সাধারণের সুবিধার্থে সামঞ্জস্য রক্ষা করত এই ঘাট।

বর্তমান সময়ে অপরিচ্ছন্ন এই ঘাটের দশা ভগ্নপ্রায়। ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের চারপাশে এখন শুধুই বসতি এবং আবর্জনা। ঘাটের জলে দাঁড়িয়ে দৈনন্দিন স্নানার্থীরা। পুরনো স্থাপত্যশৈলীর পাঁজরে বাসা বেঁধেছে পায়রার দল, দেওয়াল ঘেঁষে বেড়ে চলেছে আগাছা। আবার এখান থেকেই পায়ে হেঁটে খুব সহজেই চলে যাওয়া যায় উত্তর বন্দর থানার পিছনে মল্লিকঘাটে। ঘাট-সংলগ্ন এলাকায় সূর্যোদয় শুরু হয় ফুলের কেনাবেচা। ফুলের ভিড়ে সেখানে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকলে একটা গানের লাইন মনে হতে বাধ্য, 'পুষ্পবনে পুষ্প নাহি, আছে অন্তরে'। অন্তরের সেই সব রংবেরঙের ফুল এখন দেখছি ছড়িয়ে আছে অপরিচ্ছন্ন এই এলাকার সর্বত্র। কখনও দেখি ট্রাকের চাকার গায়ে ঝোলানো রজনীগন্ধার মালা তো অন্য কোথাও ভ্যান রিকশার উপরে অযত্নে, অনাদরে, অবহেলায় পরে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ সতেজ গোলাপ। এরই মধ্যে নোংরা প্লাস্টিকের তলা থেকে উঁকি দিচ্ছে সূর্যমুখীর দল। হোলসেল মার্কেটে হরেকরকম ফুলের দরদাম শুনে স্তম্ভিত হতে হয়। শহরের বিভিন্ন বাজারে বিক্রতব্য ফুলের দামের সঙ্গে আকাশ-পাতাল তফাত। সেটাই স্বাভাবিক। শুধু কলকাতা নয়, রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় এবং রাজ্যের বাইরেও এখান থেকে ফুলের আমদানি হয়। মল্লিকঘাটের এই বাজারকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একমাত্র এবং প্রধান ফুলের ব্যবসা কেন্দ্র হিসেবে গণ্য করা হয়।

ক্রেতা-বিক্রেতাদের কলরবে মুখরিত জায়গাটির মধ্যে দিয়ে এক সর্পিল পথ নেমে গেছে গঙ্গার দিকে। ঘাট থেকে দেখা যায় পায় পাশেই পাহাড়ের মতো দম্ভ প্রকাশ করে দাঁড়িয়ে আছে হাওড়া ব্রিজ যার বর্তমান নাম রবীন্দ্র সেতু। নয়নচাঁদ মল্লিকের পুত্র রামমোহন মল্লিক হুগলি নদীর তীরে

মল্লিকঘাটের ফুলের বাজার

১৮৫৫ সালে এই ঘাট তৈরি করেন। প্রাচীন এই ঘাটে প্রতিদিন রাত থাকতেই কেনাবেচার পর্ব শুরু হয়ে যায়। একদিকে ফুলের শোভা আর অন্যদিকে নর্দমার নোংরা জল গঙ্গায় গিয়ে মিশেছে। বর্ষাকালে এখানকার বস্থা আরও খারাপ হয়ে যায়। পুরো জায়গাটা কাদাজলে ভরে যায়। কিন্তু তার মধ্যেও থরে থরে সাজানো থাকে মরশুমি ফুল, অর্কিড, লাল আর শ্বেতপদ্ম। সব দেখে শুনে মনে হয় প্রচলিত প্রবাদ সত্যি করে আজও এই ফুলবাজারে পাঁকের মধ্যেই পদ্মফুল ফোটে।

ফোটো: লেখিকা

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ১০ এপ্রিল ২০১৭

এই ক্রোড়পত্রের সমস্ত লেখার মতামতই লেখকদের নিজস্ব।

প্রথম কলকাতা ভ্রমণ

প্রবীরবিকাশ সরকার
(লেখক ও গবেষক)

২০০৫ সালের জানুয়ারি মাসে জাপানশীর্ষ রবীন্দ্রগবেষক অধ্যাপক কাজুও আজুমার (১৯৩৪-২০১১) অনুরোধে তাঁর প্রতিনিধি হয়ে সল্টলেকে নির্মাণাধীন ভারত-জাপান সংস্কৃতি কেন্দ্র: রবীন্দ্র-ওকাকুরা ভবনের কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য কলকাতায় যেতে হয়েছিল মাত্র দু-তিন দিনের জন্য। সেটাই আমার প্রথম কলকাতা দর্শন। কলকাতার নাম শুনেছি প্রথম আমাদের মা-মাসিদের মুখে। মাঝেমাঝে কলকাতার আত্মীয়স্বজনও আসত তাদের মুখে পরিশুদ্ধ বাংলা ভাষা শুনতে বেশ লাগত। সেই কলকাতা মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এবং স্বাধীনতার পরে অন্যমাত্রা নিয়ে আমাদের কৈশোরে বিরাজ করেছে। তখন একাধারে প্রাচীন এবং আধুনিক মহানগরটি বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের কবি-লেখক-সাহিত্যিকের কাছে সাহিত্য-সংস্কৃতি-চলচ্চিত্রের মাতাল নগরী, স্বপ্নের নগরী হিসেবে প্রতিভাত হয়ে উঠেছিল। শ্রদ্ধেয় আজুমা স্যারের বিপুল অভিজ্ঞতার কাব্যিক বর্ণনার কল্যাণেই আমার কলকাতা ভ্রমণের আগ্রহ উন্মীলিত হয়। তিনি জীবনের চার দশক সময়ই কলকাতায় কাটিয়েছেন!

১ জানুয়ারি, ২০০৫। মাঝরাতে বিমান অবতরণ করল দমদম নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। জাপানে ঘনিষ্ঠ হওয়া বন্ধু বিপুলকৃষ্ণ দাসের বাসাতেই উঠছি বারাসাতে যেটা এখন কলকাতারই অধীনে।

পরদিন সকালবেলা বারাসাত শহরটি ঘুরে ঘুরে দেখলাম। পশ্চিমবঙ্গ বলে মনেই হলো না! পূর্ববঙ্গই। কারণ অধিকাংশ মানুষই বাঙ্গাল এবং পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলার ভাষায় কথা বলছে। তারা এখন ভারতের চিরস্থায়ী অধিবাসী। যাঁদের সঙ্গেই আলাপ হয়েছে তাঁরা জন্মভূমির জন্য কেঁদেছেন। শুধু বারাসাত নয়, কলকাতা শহরের দিকে যেতে যেতে বাসে, ট্যাক্সিতে, ট্রেনের মধ্যেও অনেকের সঙ্গে দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে বাংলাদেশ থেকে এসেছি জেনে আবেগে আপ্লুত হয়েছেন, সজল হয়েছেন, দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানতে চেয়েছেন দ্যাশের অবস্থা এখন কী রকম?

দমদম, শিয়ালদহ, কলেজ স্ট্রিট ও চৌরঙ্গী বিশাল চারটি অঞ্চল কলকাতার। সবচেয়ে প্রাণবন্ত কলেজ স্ট্রিট। নোংরা ময়লা লোকে লোকারণ্য হইচই বইয়ের পাহাড় কাগজের গন্ধ বিদেশিদের ভিড় অন্যরকম এক মাদকতা জাগায়। পুরনো অনেক ভবন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আশুতোষ শিক্ষা ভবন, এশিয়াটিক ভবন, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, হিন্দু স্কুল, সংস্কৃত কলেজ, মিউনিসিপালিটি ভবন ইত্যাদি এসবের কারুকাজ ও প্রবীণতা দারুণ এক নস্টালজিকতার সৃষ্টি করে। ইতিহাসখ্যাত অ্যালবার্ট হল তথা কফিহাউসের সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতেই দেখি হল ঘরের দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের বিশাল আলোকচিত্র। হলঘরভর্তি টেবিল-চেয়ারে নরনারী, তরুণ-তরুণীদের হাস্যকোলাহল, গুঞ্জন, উর্দিপরা বেয়ারাদের ব্যস্ততা, কফি ও চায়ের মনচনমনকরা গন্ধ এবং ফ্যানের মৃদুমন্দ বাতাস এমনএকটি আবহ সৃষ্টি করে আছে যে, নতুন যে কোনো আগন্তুক তারও মনে হবে, কফি হাউসটা তার যেন বহুদিনের চেনা!

৩ তারিখ মঙ্গলবার আমার জন্য ছিল একটি অবিস্মরণীয় দিন। কলকাতার দিকে যেতে যেতে দেখলাম দুপাশে কোথাও কোথাও দীর্ঘ বস্তি, রেললাইনসংলগ্ন নিম্নআয়ের মানুষের বাঁশ-কাঠের-প্লাস্টিক শিটের ঘরবাড়ি, কোথাও কোথাও নতুন বাড়িঘর, শহর গড়ে উঠছে। বিকেলবেলা দমদমে বাস থেকে নেমে পাতাল রেলে ওঠে রবীন্দ্রসদনে নামলাম। মানুষজনের ভিড় ঠেলে হেঁটে হেঁটে বহুশ্রুত কলকাতার নন্দন চত্বরে নিয়ে গেল বিপুল। শিল্পকলা জাদুঘরে গিয়ে একতলায় একটি চিত্রকর্ম প্রদর্শনী দেখলাম। তারপর বেরিয়ে এসে চত্বরে কফি কিনে পান করে সময় কাটালাম। ঠিক পাঁচটার আগেই শ্যামলদাকে দেখা গেল নন্দনের দিক থেকে হেঁটে আসতে একা, হাতে একটি থলি। উষ্ণ আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে কুশলাদি বিনিময় হলো। দারুণ একটা ভালোলাগায় বুকটা ভরে গেল।

শ্যামলদা আমাদের দুজনের পরিচয় ও কর্মকাণ্ডের পরিচয় দিলেন: আজকে আমরা প্রবীর ও বিপুলকে আমাদের মাঝে পেয়ে সত্যিই আনন্দিত। বহু বহু দূর থেকে প্রবীর আমাদের কলকাতায় এসেছে অতিথি হয়ে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং মৈত্রী স্থাপন করার জন্য। আমরা দুজনকেই জানাচ্ছি হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে স্বাগত। তাদেরকে বরণ করে নেবার জন্যই আমাদের এই ঘরোয়া সংবর্ধনা সভা। আশা করি প্রবীর ও বিপুল আমাদের এই যসামান্য প্রচেষ্টায় আনন্দিত হবে।

এরপর আমরা কয়েকজন মিলে আড্ডা দিলাম গভীররাত পর্যন্ত। শ্যামলদা, অপূর্বদা, রাণাদা ষাট-সত্তর-আশির দশকের কলকাতার টালমাটাল সাহিত্য আন্দোলনগুলো নিয়ে মাতালকরা স্মৃতিচারণ করলেন যা ছিল এক পরমানন্দ। পরের দিন আমি ও বিপুল বাংলাদেশের উদ্দেশে হরিদাসপুর সীমান্ত অতিক্রম করি।

আপনাদের সেবায়

অরিজিৎ মৈত্র

সরোদ যন্ত্রে হাতেখড়ি হয়েছিল মাত্র তিন বছর বয়সে। সেই শুরু, তারপর 'আপনাদের সেবা' করলেন শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত। যখনই অনুষ্ঠান করতেন, তখনই সূচনাপর্বে বলতেন, 'আপনাদের সেবায় আজকের বাজনা।' আগে থেকে ঠিক করে রাখতেন না ওইদিনে বিশেষ কোন রাগটি বাজাবেন। মনে করতেন সেইদিন যন্ত্র যেটা বলবে, সেটাই বাজাবেন। কৈশোর থেকেই বাবা আলাউদ্দিন সংগীতের ডিকশনারি মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। তারপরে নিজেই ওর মধ্যে থেকে শব্দ চয়ন করে কাব্য রচনা করতেন। ওপার বাংলার ব্রাহ্মণবেড়িয়া সাবডিভিশনের শিবপুর গ্রামে ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ জন্ম হয়েছিল সরোদ সম্রাট উস্তাদ আলি আকবর খাঁ সাহেবের। এরপর কলকাতা, মাইহার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ সারা পৃথিবীর মধ্যে মুনুষ্যত্বের সেতু রচনা করলেন সুরের মাধ্যমে। সব সময় মনে করতেন ওভার অ্যানালিসিস কখনওই ভালো নয় সুরের ক্ষেত্রে, তাহলে সংগীত মেটিরিয়ালিস্টিক হয়ে যাবে। তাঁর সরোদবাদনে সব সময় প্রকাশ পেত কাব্যভাব। ছাত্রদের যখন তালিম দিতেন, তখন শেখাতেন কী করে বেহাগের মতো রাগে একটা নোট থেকে আরেকটায় গ্লাইড করা যায়। মা গা মা গা পা বাজাবার সময় তীব্র মা-টা টাচ করবে, কিন্তু এয়ার স্পেস দিয়ে। এত মসৃণ হয়ে যাবে, যেন মনে হবে জ্যোৎস্না রাতে পদ্মপাতায় একফোঁটা জল গড়িয়ে চলে গেল। আত্মভোলা শিল্পীর সংগীতসত্তাই ছিল শ্বাস-প্রশ্বাস। আলি আকবর মনে করতেন ভক্তি, বিশ্বাস আর মনকে যত পরিষ্কার রাখা যায়, ততই শিল্পী সত্ত্বার উত্তরণ ঘটে। তাঁর মাড়ওয়া রাগ শুনে মনে হয় ইটস আ ক্রাই অব রকস, যেখানে করুণ রস এক জায়গায় অদ্ভুতভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর হাতের ডোরা, লয়কারি, গৎ সুনিপুণ ভাবে প্রকাশিত হতো। ইমনকল্যাণের মধ্যম পরিবেশনে একটা শার্প ডট সৃষ্টি করতেন। সেই ডট আসলে ছিল এক সুন্দরী নারীর কপালে থাকা বিন্দি বা টিপের আউট লাইন। মধ্যরাত্রে শিল্পীর বাজানো দরবারি কানাড়া, চন্দ্রনন্দন, চন্দ্রকৌস মনের ভিতর থেকে বহুদিনের জমে থাকা কান্নাকে ঠেলে বের করে। সে অশ্রু আনন্দের না বেদনার জানি না। তবে সেই ধারা বয়ে চলে অবিরাম। আলি আকবর খাঁ সাহেব যখনই বাজাতেন তখনই সেই সুরের জালে নান্দনিক চেতনার প্রকাশ করতেন। সংগীত যে শুধুমাত্র নোটেশনে সীমাবদ্ধ নয় সেটা তাঁর সরোদ বলে দিত। অনুভূতি থেকে নোটকে ফিল না করলে যন্ত্রের শব্দতরঙ্গ মিথ্যে হয়ে যায়। সাংবাদিক, লেখক, শংকরলাল ভট্টাচার্যের কাছে শুনেছিলাম ষাটের দশকের কোনও এক বছরে প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য দুর্গাপুজো ঠিকমতো জমেনি। বিজয়া দশমীর দিন কুড়ি পরে কলকাতার এক প্রেক্ষাগৃহে খাঁ সাহেব বাবা আলাউদ্দিন সৃষ্ট রাগ দুর্গেশ্বরী বাজিয়ে মাকে আবার পুনরায় যেন ফিরিয়ে আনলেন, তাঁর বাজনার মাধ্যমেই সুরের চরিত্র, তালের চরিত্রর সঙ্গে পরিচিত হতেন শ্রোতারা। পণ্ডিত রবিশঙ্করের সঙ্গে খাঁ সাহেবের যুগলবন্দি শোনার সৌভাগ্য কখনও হয়নি। কিন্তু দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়াহাট মার্কেটের উপরে এক সাধারণ বাড়ির মাটিতে বসে ছাত্র-ছাত্রীদের এক মনে তালিম দিয়ে যাচ্ছেন এমন দৃশ্য দেখার সুযোগ ঘটেছিল। দেখতাম কীভাবে তালগুলো লয়ের বরাবর স্পিডে, দুগুণ স্পিডে, পাঁচগুণ স্পিডে বাজতেন। একটা সম থেকে আরেকটা সমে যেতে খাঁ সাহেব কীভাবে বাজাবেন, কেউ সেটা প্রেডিক্ট করতে পারতেন না। বাজাবার সময় তাঁর সাংগীতিক পরিকল্পনা তাৎক্ষণিক প্রকাশ পেত। দর্শকরা দেখেছিলেন 'ক্ষুধিত পাষাণ' ছবিতে সুস্তা নদী, করিম খাঁ-র কাব্য আর আলি আকবরের বৈচিত্রময় বাগেশ্রী সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। চলচ্চিত্রপ্রেমীরা দেখেছিলেন ঝিন্দ আর ঝড়োয়ার রাজ্যের আকাশ-বাতাস অণুরণিত হতো তাঁর আহির ভৈরব, বসন্ত মুখারি, ললিতে ও বিভাসে। 'দেবী' ছায়াছবির সংগীতেও ছিল বাগেশ্রীর ছোঁওয়া। বহু ছায়াছবিতেও সংগীত পরিচালনা করেছিলেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'একই অঙ্গে এত রূপ', 'অন্তরীক্ষ', 'নূপুর', 'অযান্ত্রিক', 'রাজদ্রোহী' ইত্যাদি। আমাদের সেবায় এই শহরে শেষবারের মতো রাগমালা বাজিয়েছিলেন ডোভার লেন মিউজিক কনফারেন্সে। সব সময় বলতেন, 'হোয়াট এভার আই অ্যাম ডুয়িং ইটস ইওরস। আই অ্যাম জাসট ওয়ার্কিং ফর ইউ।' সরোদ যন্ত্র আগেও বেজেছে, এখনও বাজছে আর ভবিষ্যতেও বাজবে, কিন্তু ওয়ার্ল্ড সিটিজেন আলি আকবর খাঁ সাহেবের মতো মর্মস্পর্শী বাদনশৈলী আর হবে কিনা সন্দেহ!

আলি আকবর, মহাপুরুষ মিশ্র ও পুত্র আশিস খাঁ